ইসলামী আন্দোলন

সাফল্যের শর্তাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
অনুবাদক ঃ আব্দুল মান্নান তালিব

ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনী

— প্রকাশকের কথা

এই পৃথিবীর বুকে মানুষের কোন উদ্দেশ্য,কোন আন্দোলন, সংস্কারমূলক কোন পদক্ষেপই সফলকাম হতে পারে না যতক্ষণ না সেই আন্দোলনের সৈনিকদের মধ্যে সেই আন্দোলনের বিশেষ গুণগুলো দেখা যায়। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, বিপ্লব যতই মুক্তির প্রতিশ্রুতিশীল হোক না কেন আন্দোলনের কর্মীরা তাদের চরিত্রকে সুন্দর, বলিষ্ঠ, উন্নত আর উজ্জ্বল করতে না পারলে সফলতার স্বপ্ন নিছক কল্পনাই রয়ে যাবে।

সমস্যা সঙ্কুল এই দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ–প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আখেরাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়ার উত্তম পথতো আর নেই। তাইতো এ আন্দোলন তার কর্মীর কাছে স্বাভাবিকভাবেই আশা করে অধিক কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ আর কোরবানীর। দাবী করে বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের।

মাওলানা মওদূদী সহজ সরল ভাষায় এই পুস্তকে সেই সব গুণাবলীর প্রতি আলোকপাত করেছেন যে সব গুণাবলী ইসলামকে যারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের পুঁজি হওয়া উচিত। এই মূল্যবান বইটির প্রকাশ করতে পেরে তাই মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী আন্দোলন ঃ
সাফল্যের শর্তাবলী

যারা সত্যিই একটি ইসলামী সমাজ কায়েম করতে চান তাদের–

সর্বপ্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের জাতির মধ্যে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খার মোটেই অভাব নেই। আসল অভাব আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের এবং তার চাইতেও বেশী অভাব যোগ্যতার। এ কাজের জন্যে যে মৌলিক গুণাবলীর প্রয়োজন অধিকাংশ লোকের মধ্যে তা অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে তা হচ্ছে আমাদের জাতির সমগ্র প্রভাবশালী অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে বিকৃতি ও ভাঙ্গন সৃষ্টিতে মুখর। আর যারা বিকৃতি ও ভাঙ্গনের কাজে লিপ্ত নেই তারাও সৃষ্টি ও বিন্যাসের চিন্তামুক্ত। সমাজ সংস্কার ও গঠনের প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তৃতীয় যে বিষয়টি থেকে গাফেল থাকা উচিৎ নয় সেটি হচ্ছে, বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙ্গার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার। আর যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে জনগনের উপযুক্ততা বা অনুপযুক্ততা ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা সোপর্দ করার ওপরই সরকারের উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত পূর্ণতঃ নির্ভরশীল। ভাঙ্গার কাজে যারা লিপ্ত থাকে তারা জনগণ যাতে কোনদিন নির্ভুল নির্বাচনের যোগ্য না হতে পারে সেজন্যে জনগণকে প্ররোচিত করার কাজে যত শক্তি ব্যয় করে অন্য কোনো কাজে তত করে না।

এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে একটি ভয়াবহ দৃশ্য সৃষ্টি করে যা প্রথমাবস্থায় মানুষের মনে নিরুৎসাহের সঞ্চার করে এবং চারিদিকের নৈরাশ্যের মধ্যে সে চিন্তা করতে থাকে, এখানে কোনো কাজে কি সফলতা সম্ভব? কিন্তু এগুলোর বিপরীতপক্ষে আরো কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলো সামনে রাখলে নিরাশার মেঘ কেটে যেতে থাকে এবং আশার আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রথমটি হচ্ছে আমাদের সমাজ কেবল অসৎ লোকের আবাসস্থল নয়, এখানে কিছু সংখ্যক সৎলোক ও আছে। তারা কেবল সংশোধন ও চরিত্র গঠনের আকাঙ্খা

মনে পোষন করে না, বরং তাদের মধ্যে আগ্রহ ও যোগ্যতা রয়েছে। আর এর মধ্যে কিছুটা অভাব থাকলেও সামান্য যত্ন ও প্রচেষ্টায় তা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় হচ্ছে, আমাদের জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবণ নয়। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুন তারা প্রতারিত হতে পারে এবং প্রতারিত হয়ে আসছে, কিন্তু প্রতারণাকারীরা তাদেরকে যে বিকৃতির সম্মুখীন করে তার ওপর তারা সন্তুষ্ট নয়। বিচক্ষণতার সাথে সুসংবদ্ধ ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালালে দেশের জনমতকে অবশেষে সংশোধন প্রয়াসী শক্তিগুলোর সমর্থকে পরিণত করা যেতে পারে। সমাজে অসৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের ফলে যে সমস্ত অনাচারের সৃষ্টি হচ্ছে জাতির বৃহত্তম অংশ খোদ তার পরিপোষক হলে অবশ্যি নিরাশার কথা ছিল। কিন্তু আসল পরিস্থিতি তা নয়।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, বিকৃতির জন্যে যারা কাজ করে যাচ্ছে তারা সকল প্রকার সুযোগ–সুবিধা লাভ করেছে কিন্তু দু'টি সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। এক চারিত্রিক শক্তি, দুই–ঐক্যের শক্তি।

সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহ্ তায়ালার নিজের কাজ। এজন্যে যারা প্রচেষ্টা চালায় তারা আল্লাহ্র সমর্থন লাভ করে তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদের ছবর ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষনতা পরিহার করলে চলবে না। এ ধরনের লোক যতই স্বল্প সংখ্যক হোক না কেন এবং তাদের সাজ–সরঞ্জাম–উপকরণাদি যতই সামান্য হোক না কেন অবশেষে আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন তাদের সকল অভাব পূরণ করে দেয়।

আপাতঃ নৈরাশ্যের পেছনে আশার এ আলোকচ্ছটা একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের কেবল সম্ভাবনার উন্মেষ সাধনই নয় বরং তার সফল প্রতিষ্ঠারও দিগন্ত উম্মুক্ত করে। তবে প্রয়োজন হচ্ছে, যারা এ কাজের সত্যিকার আকাঙ্খা পোষন করে তাদের আশা ও আকাঙ্খার মনজিল অতিক্রম করে কিছু করার জন্যে অগ্রসর হতে হবে এবং সাফল্যের জন্যে আল্লাহ যে নীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতে এগিয়ে যেতে হবে। আপনি কেবল অসৎ কাজ ও দোষত্রুটির সমালোচনা করে যাবেন এবং সেগুলো নিছক আপনার কথার জোরে শুধরে যাবে, এটা আল্লাহর নীতি নয়। আপনি হাত ও পায়ের শক্তি ব্যবহার না করা পর্যন্ত জংগলের একটি কাটা এবং পথের একটি পাথরও সরে না। তাহলে সমাজের দীর্ঘকালের দোষত্রুটিগুলো নিছক

নিছক আপনার কথার জোরেই বা কেমন করে দূর হতে পারে? কৃষকের পরিশ্রম ছাড়া ধানের একটি শীষও উৎপন্ন হয় না। তাহলে নিছক দোয়া ও আশার মাধ্যমে কেমন করে সমাজে সততা ও সৎপ্রবণতার সবুজ শ্যামল শস্য উৎপাদনের আশা করা যেতে পারে? যখন আমরা ময়দানে নেমে কাজ করি এবং আল্লাহর নিকট সাফল্যের দোয়া চাই তখনই সমালোচনা কার্যকরী হয়। নিঃসন্দেহে ফেরেশ্‌তাদের আগমন ঘটে। কিন্তু তারা নিজেরা লড়বার জন্যে আসে না। বরং যে সকল সত্যপন্থী খোদার পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে লড়াই করতে থাকে তাদের কে সাহায্য করার জন্যে আসে। কাজেই যাদের মনে কাজ করার আগ্রহ আছে তাদের মিথ্যা আশা–আকাঙ্খার পথ পরিহার করে সুস্থ মস্তিষ্কে এ কাজের যাবতীয় দাবী ও চাহিদা উপলব্ধি করা উচিৎ। অতঃপর তারা কি সত্যিই এ কাজ করবেন, না নিছক সমাজের বিকৃতি দেখে অশ্রুপাত করবেন এবং সমাজ গঠনের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করেই ক্ষান্ত হবেন, এ ব্যাপারে যথার্থ চিন্তাভাবনা করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা উচিত। কাজ করার সিদ্ধান্ত যিনি করবেন তিনি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয় বরং সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে চিন্তেই করবেন। সাময়িক উত্তেজনার বশে মানুষ বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিতে এবং প্রান দান করতে পারে কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বশে একটি উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সারা জীবন পরিশ্রম করা তো দূরের কথা মাত্র চারদিন কোন অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকা অথবা কোন সৎ কাজের উপর অটল থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজেদের সমগ্র জীবন গঠনমূলক ভাবে কাজে নিয়োগ করতে প্রস্তুত হয় একমাত্র তারাই একাজ করতে পারে।

কাজ করার আগ্রহ ও উদ্দেশ্য গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ সাধারণতঃ কর্মসূচীর প্রশ্ন উথাপন করে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, কর্মের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর মধ্যবর্তী স্থানে কর্মীর নিজের সত্তাই হচ্ছে কাজের আসল ভিত্তি ও নির্ভর। এ বিষয়টিকে বাদ দিয়ে কাজ ও কর্মসূচীর কথা বলা ঠিক নয়। কাজ করার জন্যে কেবল সংকল্পই যথেষ্ট এবং এরপর শুধুমাত্র কর্মসূচীর প্রয়োজন থেকে যায়, একথা মনে করা ভুল। এ ভুল ধারণার কারণে আমাদের এখানে অনেক বড় বড় কাজ শুরু হয়েছে এবং পরে তা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই কর্মসূচী ও পরিকল্পনা আসল নয়, আসল হচ্ছে এগুলোর বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গুণাবলী। কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূলে এটিই হচ্ছে আসল কার্যকর শক্তি। ব্যক্তির প্রতিটি দুর্বলতা

কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে এবং তার প্রতিটি গুন কাজকে সুষমা-মণ্ডিত করে। সে উন্নত ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হলে একটি ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও বাজে কর্মসূচীকেও এমন সফল পরিচালনার মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্যে উন্নীত করে যে মানুষ অবাক হয়ে যায়। বিপরীতপক্ষে তার যোগ্যতার অভাব থাকলে উত্তম কাজও পন্ড হয়ে যায়। এমনকি অযোগ্য লোক যে কাজ সম্পাদনে ব্রতী হয় তার নির্ভুলতা সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ জাগে। কাজেই সংস্কার ও গঠনমূলক কাজের বাস্তব পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করার আগে এ কাজ সাধনের জন্যে যেসব লোক এগিয়ে আসবে তাদের কোন্ ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে, কোন্ ধরনের গুণাবলী সমন্বিত হতে হবে এবং কোন্ ধরনের দোষ ত্রুটি থেকে তাদেরকে মুক্ত হতে হবে, উপরন্তু এ ধরনের লোক গঠনের উপায়-পদ্ধতি কি, এ ব্যাপারেও যথাযথ পর্যালোচনা করতে হবে :

পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টিকে আমরা নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে বর্ণনা করবো।

(১) এ উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

(২) তাদের মধ্যে সামষ্টিক পর্যায়ে যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

(৩) ইসলাম প্রচার, ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্যে যেসব গুণ থাকা উচিৎ।

(৪) ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে যে সব বড় বড় দোষত্রুটি থেকে তাদের মুক্ত থাকা উচিৎ।

(৫) অভিপ্রেত গুণাবলীর বিকাশ সাধনে ও অনভিপ্রেত গুণাবলী থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মুক্ত রাখার জন্যে যেসব উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

দুনিয়ায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্যে আল্লাহ্র সাহায্যের পর সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠি হচ্ছে এ কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব গুণাবলী। কতিপয় গুণাবলী ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকতে হবে। কতিপয় গুনাবলী সামষ্টিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কতিপয় গুণাবলী সংস্কার ও গঠনমূলক কার্য সম্প্রসারণের জন্যে তাদের মধ্যে থাকতে হবে। আবার কতিপয় দোষত্রুটি থেকে যদি তারা নিজেদেরকে মুক্ত না রাখে তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সবার আগে এ বিষয়গুলো অনুধাবন

করতে হবে। ফলে যারা এ খেদমতের সত্যিকার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তারা নিজেদের অভিপ্রেত গুনাবলীর লালন ও অনভিপ্রেত গুণাবলী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্যে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে পারবে। সমাজ গঠনের জন্যে এভাবে ব্যক্তি গঠন হচ্ছে প্রথম শর্ত। কারণ যে নিজেকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করতে পারে না সে অন্যকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান ঃ

ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে সর্ব প্রথম যে জিনিসটি সে কায়েম করতে চায় তা জানতে ও বুঝতে হবে। এ কাজের জন্যে ইসলামের নিছক সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয় বরং কমবেশী বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এজন্যে এ পথের প্রত্যকটি পথিককে এবং আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীকে মুফ্‌তি বা মুজতাহিদ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই তবে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে জাহেলী চিন্তা কল্পনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের নীতি–পদ্ধতি থেকে আলাদা করে জানতে হবে এবং জীবনেরে বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কি পথ দেখিয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না এবং সমাজ পরিগঠনের জন্যে যথার্থ পথে কোন কাজ করতেও সক্ষম হয় না। সাধারন কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান এমন পর্যায়ে থাকতে হবে যার ফলে তারা গ্রাম ও শহরের লোকদেরকে সহজ–সোজা ভাবে দ্বীনের কথা বুঝাতে সক্ষম হবে। কিন্তু উন্নত বুদ্ধি–বৃত্তির অধিকারী কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান অধিকমাত্রায় থাকতে হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। শিক্ষিত লোকদের সকল প্রকার সন্দেহ–সংশয় নিরসন করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। ইসলামের আলোকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষা ও শিল্পকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে বিন্যস্ত করতে হবে। ইসলামের অনাদি ও চিরন্তন ভিত্তির ওপর একটি নূতন সভ্যতা–সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের ত্রুটিপূর্ণ অংশকে ত্রুটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো সমালোচনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে। এবং এই সংগে যা কিছু ভাঙার তাকে ভেঙে ফেলে তদস্থলে উন্নততর বস্তু গড়ার এবং যা

কিছু রাখার তাকে কায়েম রেখে একটি উত্তম ও উন্নততর ব্যবস্থায় তাকে ব্যবহার করার মতো গঠনমূলক যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী তাকে হতে হবে।

ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ঃ

এ উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্রতী ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের পর দ্বিতীয় যে অপরিহার্য গুণটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে, যে দ্বীনের ভিত্তিতে সে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তার ওপর নিজেকে অবিচল ঈমান রাখতে হবে। ঐ জীবনব্যবস্থার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে তার নিজের মন নিঃসংশয় হতে হবে। এ ব্যাপারে তার নিজের চিন্তা পুরোপুরি একাগ্র হতে হবে। সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ একাজ করতে পারে না। মানসিক সংশয় এবং বিশৃংখল চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মন দোদুল্যমান, যার চিন্তা একাগ্র নয়, চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন পথ যাকে বিভ্রান্ত করে অথবা করতে পারে, সে ধরনের কোনো লোক এ কাজের উপযোগী হতে পারে না। যে ব্যক্তি এ কাজ সম্পন্ন করবে তাকে নিঃসংশয় চিত্তে খোদার ওপর বিশ্বাস করতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত খোদার গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের ওপর অবিচল ঈমান আনতে হবে। তাকে আখেরাতের ওপর অটল বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কুরআনে আখেরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্যপথ এবং তার বিরোধী বা তার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেকটি পথই ভ্রান্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মানুষের যে কোনো চিন্তা ও যে কোনো পদ্ধতি যাচাই করার একটি মাত্র মানদন্ড আছে এবং তা হচ্ছে খোদার কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। এ মানদন্ডে যে উতরে যাবে সে সত্য ও অভ্রান্ত আর যে উতরে যাবে না সে বাতিল ও ভ্রান্ত। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্যে এ সত্যগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং চিন্তার পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সামান্য দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করে অথবা এখনো অন্যান্য পথের প্রতি আগ্রহশীল তার এ প্রাসাদের কারিগর হিসেবে অগ্রসর হবার আগে নিজের এ দুর্বলতার চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

চরিত্র ও কর্ম ঃ

তৃতীয় অপরিহার্য গুণটি হচ্ছে, কাজ কথা অনুযায়ী হতে হবে। যে বস্তুকে সে সত্য মনে করে তার অনুসরণ করবে, যাকে বাতিল গণ্য করে তা থেকে দূরে সরে

যাবে, যাকে নিজের দ্বীন ঘোষণা করে তাকে নিজের চরিত্র ও কর্মের দ্বীনে পরিণত করবে এবং যে বস্তুর দিকে সে বিশ্ববাসীকে আহবান জানায় সর্বপ্রথম সে নিজে তার আনুগত্য করবে। সৎকাজের আনুগত্য ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে তাকে বাইরে কোনো চাপ প্রভাবের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিৎ নয়। কোনো কাজ করলে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে, কেবল এতটুকু কারণেই তার আন্তরিক আগ্রহ ও ইচ্ছা সহকারে ঐ কাজ সম্পন্ন করা উচিৎ। আবার কোনো কাজ নিছক খোদার নিকট অপছন্দনীয় হবার কারণেই সে তা থেকে বিরত থাকবে। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেবল সাধারণ অবস্থায় হওয়া উচিৎ নয় বরং তার চারিত্রিক শক্তি এতই উন্নত পর্যায়ের হতে হবে যে, অস্বাভাবিক বিকৃত পরিবেশে তাকে সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ লালসার মোকাবেলা করে এবং সবরকম বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও সত্যপথে অবিচল থাকতে হবে। যার মধ্যে এ গুণ নেই সে সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু সে প্রকৃত কর্মী হতে পারে ন। ইসলামের জন্যে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে সামান্যতম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও দরদ রাখে সে এ কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। এমনকি যে ব্যক্তি ইসলাম অস্বীকারকারী ও তার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তৎপর নয় সেও অনেকটা এর সহায়ক হতে পরে। কিন্তু এ ধরনের কোটি কোটি সাহায্যকারী থাকলেও কার্যতঃ ইসলামী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে না এবং জাহেলিয়াতের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনের গতি রুদ্ধ হতে পারে না। কার্যতঃ এ কাজ একমাত্র তখনই সম্পাদিত হতে পারে, যখন এর জন্যে এমন এক দল লোক অগ্রসর হবে যারা জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে চরিত্র ও কর্মশক্তি সমন্বিত হবে এবং যাদের ঈমান ও বিবেক এত বিপুল জীবনী-শক্তির ধারক হবে যার ফলে বাইরের কোনো উস্কানী ছাড়াই নিজেদের অভ্যন্তরীণ তাকীদে তার দ্বীনের চাহিদা ও দাবী পূরন করতে থাকবে। এ ধরনের কর্মীরা যদি ময়দানে নেমে আসে তাহলে মুসলিম সমাজে এমনকি অমুসলিম সমাজেও সর্বত্র যে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও সাহায্যকারী পাওয়া যায় তাদের উপস্থিতিও ফলপ্রসূ হতে পারে।

দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য ঃ

সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনে ব্রতী কর্মীদের মধ্যে এ তিনটি গুণাবলীর সাথে সাথে আর একটি গুণ থাকতে হবে। তা হলো খোদার বাণী বুলন্দ করা এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা নিছক তাদের জীবনের একটি আকাঙ্খার পর্যায়ভুক্ত হবে না বরং এটিকে

তাদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে। এক ধরনের লোক দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়, তার ওপর ঈমান রাখে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তাদের জীবনের লক্ষ্য বিবেচিত হয় না বরং সততা ও সৎকর্ম করে এবং এই সংগে নিজেদের দুনিয়ার কাজ কারবারে লিপ্ত থাকে। নিঃসন্দেহে এরা সৎলোক। ইসলামী জীবনব্যবস্থা কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে এরা তার ভালো নাগরিকও হতে পারে। কিন্তু যেখানে জাহেলী জীবনব্যবস্থা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তাকে সরিয়ে তদস্থলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানে নিছক এ ধরনের সৎলোকদের উপস্থিতি কোনো কাজে আসে না বরং সেখানে এমন সব লোকের প্রয়োজন হয় যাদের জীবনোদ্দেশ্যরূপে এ কাজ বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ তারা অবশ্যি করবে কিন্তু তাদের জীবন একমাত্র এ উদ্দেশ্যের চারিদিকে আবর্তন করবে। এ উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্যে তারা হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ জন্যে নিজেদের সময়-সামর্থ, ধন-মাল ও দেহ-প্রাণের সকল শক্তি এবং মন-মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত হবে। এমন কি যদি জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাতেও তারা পিছপা হবে না। এ ধরনের লোকেরাই জাহেলিয়াতের আগাছা কেটে ইসলামের পথ পরিষ্কার করতে পারে।

দ্বীনের সঠিক নির্ভুল জ্ঞান, তার প্রতি অটল বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং তার প্রতিষ্ঠাকে জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা এগুলো এমন সব মৌলিক গুণ যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টারত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা উচিত। এ গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ এ গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ছাড়া এ কাজ সম্পাদনের কল্পনাই করা যেতে পারে না।

বলাবাহুল্য, এহেন ব্যক্তিরা যদি সত্যিই কিছু করতে চায় তাহলে তাদের একটি দলভুক্ত হয়ে এ কাজ করা অপরিহার্য। তারা যে কোনো দল-ভুক্ত হোক এবং যে কোন নামে কাজ করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনা যেতে পারে না। এজন্যে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা নয়, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কাজেই একে একটি সর্ববাদী সম্মত সত্য মনে করে এখন আমরা এ ধরনের দলের মধ্যে দলীয় যে সব গুন থাকা অপরিহার্য সেগুলোর আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

দলীয় গুণাবলী

ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ঃ

এ ধরনের দলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রাসাদের প্রত্যেকটা ইট মজবুতভাবে একটার সাথে আরেকটা মিশে থাকলে তবে প্রাসাদটি মজবুত হয়। সিমেন্ট এ ইটগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে রাখে। তেমনিভাবে কোনো দলের সদস্যদের দিল পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ দিলগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পারস্পরিক কল্যাণাকাঙ্খা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারী দিল কখনো পরস্পর মিলেমিশে থাকতে পারে না। মোনাফেকী ধরনের মেলামেশা কখানো সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না। স্বার্থবাদী ঐক্য মোনাফেকীর পথ প্রশস্ত করে। আর নিছক একটি শুষ্ক-নিরস ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোনো সৌহার্দ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে না। কোনো পার্থিব স্বার্থ এ ধরনের সম্পর্কহীন লোকদেরকে একত্রিত করলেও তারা নিছক বিক্ষিপ্ত হবার জন্যেই একত্রিত হয় এবং কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেই শেষ হয়ে যায়। যখন একদল নিঃস্বার্থ চিন্তার অধিকারী ও জীবনোদেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী লোক একত্রিত হয় অতঃপর চিন্তার এই নিঃস্বার্থতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি এ অনুরাগ তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে কেবলমাত্র তখনই একটি মজবুত ও শক্তিশালী দলের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের দল আসলে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় অটুট হয়। শয়তান এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কোনো পথই পায় না। আর বাহির থেকে বিরোধিতার তুফান এনে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেও একে স্থানচ্যুত করতে পারেনা।

পারস্পরিক পরামর্শ ঃ

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে, এ দলকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং পরামর্শের নীতি-নিয়ম পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যে দলের

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো চলে এহেন স্বেচ্ছাচারী দল আসলে কোনো দল হয় না বরং হয় নিছক একটি জনমন্ডলী। এহেন জনমন্ডলী কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে যে দলের এক ব্যক্তি বা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি গ্রুপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং বাদ বাকি সবাই তার ইংগিতে পরিচালিত হয় এহেন দলও বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে যথার্থ কাজ হতে পারে। কারণ এভাবে বহুলোক বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করে একটি ভাল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে বরং এর মাধ্যম আরো দুটি ফায়দাও হাসিল হয়।

এক, যে কাজের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র দলের পরামর্শ কার্যকরী থাকে সমগ্র দল মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে একথা কেউ চিন্তা করে না যে, ওপর থেকে তার ওপর কোনো বস্তু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুই, এভাবে সমগ্র দল সমস্যা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করার শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি দল ও তার কাজের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে এবং তার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে। কিন্তু এজন্যে শর্ত হচ্ছে পরামর্শের নীতি-নিয়ম পালন করে চলতে হবে। আর পরামর্শের নিয়মনীতি হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ইমানদারীর সাথে নিজের মত পেশ করবে এবং মনের মধ্যে কোনো কথা লুকিয়ে রাখবে না। আলোচনায় কোনো প্রকার জিদ, হঠধর্মিতা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নেবে না। এবং সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন মতের অধিকারীরা নিজেদের মত পরিবর্তন না করলেও দলীয় সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্যে সানন্দে অগ্রসর হবে। এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে পরামর্শের সমস্ত ফায়দাই নষ্ট হয়ে যায়। বরং এটিই পরিশেষে দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

সংগঠন ও শৃংখলা

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, সংগঠন, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও একটি টিমের ন্যায় কাজ করা। একটি দল তার সব রকমের গুণাবলী সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিজের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করতে সক্ষম না হওয়ার কারণেই ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এটি হয় সংগঠন, শৃংখলা ও সহযোগিতার

অভাবের ফলশ্রুতি। ধ্বংসমূলক কাজ নিছক হৈ-হাংগামার সাহায্যেও সমাধা হতে পারে। কিন্তু কোন গঠনমূলক কাজ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। সমগ্র দলের একযোগে দল কর্তৃক গৃহীত নীতি-নিয়মের অনুসারী হওয়ার নামই হচ্ছে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। দলের মধ্যে যে ব্যক্তিকে কোনো পর্যায়ে কর্তৃত্বশীল করা হয় তার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। যে কর্মীদের ওপর সম্মিলিতভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকতে হবে। দলের মেশিন এমন পর্যায়ে সক্রিয় হতে হবে যে, একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সাথে সাথেই তাকে কার্যকরী করার জন্যে তার সকল কল-কব্জা চালু হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এধরনের দলই কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অন্যথায় যেসব দল কল-কব্জা সংগ্রহ করে কিন্তু সেগুলো যথাস্থানে সংযোজিত করে যথারীতি মেশিনের মতো চালাবার ব্যবস্থা করেনি তাদের থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়ায়।

সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা ঃ

সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, দলের মধ্যে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার যোগ্যতাও দলের থাকতে হবে। অন্ধ অনুসারী ও সরলমনা ভক্তবৃন্দ যতই সঠিক স্থান থেকে কাজ শুরু করুক না কেন এবং যতই নির্ভুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হোকনা কেন, অবশেষে তারা সমগ্র কাজ বিকৃত করে যেতে থাকে। কারণ মানবিক কাজে দুর্বলতার প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দুর্বলতার প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে না অর্থাৎ তা চিহ্নিত করা দোষ রূপে বিবেচিত হয়না, সেখানে গাফলতি বা অক্ষমতা পূর্ণ নীরবতার কারণে সব রকমের দুর্বলতা, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দলের সুস্থ-সবল অবয়ব ও রোগমুক্ত দেহের জন্যে সমালোচনার অভাবের চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আর সমালোচনামূলক চিন্তাকে দাবিয়ে দেয়ার চাইতে দলের বড় অকল্যাণাকাঙ্খা আর কিছুই হতে পারে না। এ সমালোচনার মাধ্যমেই দোষ-ত্রুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয় এবং তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু সমালোচনার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে এই যে, তা দোষ দেখাবার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না বরং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এবং এই সঙ্গে দ্বিতীয় সমান গুরুত্বপূর্ণ

শর্ত হচ্ছে এই যে, সমালোচনাকারীকে যথার্থ সমালোচনার পদ্ধতিতে সমালোচনা করতে হবে। একজন দোষ সন্ধানকারী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচকের বেয়াড়া, বেকায়দা, অসময়োচিত ও বাজে সমালোচনাও দলকে ঠিক একই পর্যায়ের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী

এ পর্যন্ত আমরা সমাজ সংশোধন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের অপরিহার্য গুনাবলী আলোচনা করেছি।

এ প্রসংগে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিছক প্রারম্ভিক ও মৌলিক গুণাবলীর পর্যায়ভুক্ত। কোনো ব্যবসা শুরু করতে হলে যেমন একটা সর্বনিম্ন পুঁজির প্রয়োজন হয়, যা না হলে ঐ ব্যবসা শুরু করাই যেতে পারে না। তেমনি এ গুণাবলীই হচ্ছে ব্যক্তির সর্বনিম্ন নৈতিক পুঁজি, এগুলো ছাড়া সমাজ সংশোধন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের কাজ শুরু করাই যেতে পারে না। বলাবাহুল্য যে সব লোক নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয় বা এ ব্যাপারে মানসিক নিশ্চিন্ততা ও একাগ্রতা লাভ করতে পারেনি অথবা তাকে নিজেদের চরিত্র, কর্ম ও বাস্তব জীবনের ধর্মে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নিজেদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করেনি, তাদের দ্বারা কোনো ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাই করা যায় না। অনুরূপভাবে যদি অভিপ্সীত গুণাবলী সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের নিছক সমাবেশ হয় কিন্তু তাদের দিল পরস্পরের সাথে সংযুক্ত না হয়, তাদের মধ্যে সহযোগিতা শৃংখলা ও সংগঠন না থাকে, তারা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করার রীতিতে অভ্যস্ত না থাকে এবং পারস্পরিক পরামর্শ ও সমালোচনার যথার্থ পদ্ধতি সম্পর্কে যদি তারা অজ্ঞ থাকে, তাহলে তাদের নিছক সমাবেশ কোনো প্রকার ফলপ্রসূ হতে পারে না। কাজেই একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, ইতিপূর্বে আমি যে চারটি ব্যক্তিগত ও চারটি সামষ্টিক গুণাবলীর উল্লেখ করে এসেছি সেগুলোই হচ্ছে এ কাজ শুরু করার প্রাথমিক পুঁজি এবং একমাত্র এ প্রেক্ষিতেই সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কাজের বিকাশ ও সাফল্যের জন্যে নিছক এতটুকু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুঁজি যথেষ্ট–এ ধারণা যথার্থ নয়। এখন আমরা অপরিহার্য গুণাবলীর আলোচনা করবো।

খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা :

এ গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খোদার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জাতি বা দেশের জন্যে করা যেতে পারে, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভের যাবতীয় দিক সম্ভাবনা সহকারে সম্পাদন করা যেতে পারে, খোদা বিশ্বাসই নয়, খোদাকে অস্বীকার করেও করা যেতে পারে এবং এর ভেতর সব রকম পার্থিব সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ। যে পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক খোদার সাথে যথার্থ শক্তিশালী ও গভীর না হয় এবং সে একমাত্র খোদার জন্যে কাজ করতে মনস্থ না করে সে পর্যন্ত এ কাজে কোনো প্রকার সাফল্য সম্ভব নয়। কারণ এখানে মানুষ খোদার দ্বীনকে কায়েম করতে চায়। আর এজন্যে সবকিছু খোদার জন্যে করা প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টিই কাম্য হতে হবে। একমাত্র খোদাপ্রীতিই এ কর্মের মূল প্রেরণা হতে হবে। তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। তাঁরই নিকট থেকে পুরস্কারের আশা রাখতে হবে। তাঁরই হেদায়াত এবং তাঁরই আদেশ নিষেধের আনুগত্য করতে হবে। এবং তাঁরই নিকট জবাবদিহির ভয়ে সমগ্র মন আচ্ছন্ন থাকতে হবে। এছাড়া আর কোনো ভয়, লোভ-লালসা প্রীতি ও আনুগত্যের মিশ্রণ এবং অন্য যে কোন স্বার্থের অন্তর্ভুক্তি এ কাজকে যথার্থ পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং এর ফলে অন্যকিছু কায়েম হতে পারে কিন্তু খোদার দ্বীন কায়েম হতে পারে না।

আখেরাতের চিন্তা :

এ প্রথমোক্ত গুণটির সাথে নিকট সম্পর্কযুক্ত দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে আখেরাতের চিন্তা। যদিও দুনিয়াই মুমিনের কর্মস্থল এবং সবকিছু তাকে এখানেই করতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে এ দুনিয়ার জন্যে কাজ করে না বরং আখেরাতের জন্যে করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না বরং তার লক্ষ্য থাকে আখেরাতের ফলাফলের প্রতি। যেসব কাজ আখেরাতে লাভজনক সেসব তাকে করতে হবে এবং যেসব কাজের ফলে আখেরাতের কোনো লাভ হবে না সেগুলো তাকে ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার যেসব লাভ আখেরাতে ক্ষতিকর সেগুলো তাকে বর্জন করতে হবে আর দুনিয়ার যেসব ক্ষতি আখেরাতে লাভজনক সেগুলো তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে একমাত্র আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের চিন্তা করতে

হবে। দুনিয়ার কোনো শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার চোখে থাকা উচিৎ নয়। এ দুনিয়ায় তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে সফলতা বা ব্যর্থতা যারই সম্মুখীন হোক, তার প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক, সে পুরস্কার লাভ করুক বা পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হোক, সকল অবস্থায় তাকে এ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত যে, যে খোদার জন্যে সে এ পরিশ্রম করছে তাঁর দৃষ্টি থেকে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই এবং তাঁর নিকট আখেরাতের চিরন্তন পুরস্কার পাওয়া থেকে সে কোনক্রমেই বঞ্চিত হবে না এবং সেখানকার সাফল্যই হচ্ছে আসল সাফল্য। এ মানসিকতা ছাড়া এ পথে মানুষের পক্ষে নির্ভুল লক্ষ্যের দিকে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়। দুনিয়ার স্বার্থের সামান্যতম মিশ্রণ এর মধ্যে থাকলে এখানে পদস্খলন ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করে অগ্রসর হয় খোদার পথে একটি না হলেও দু'চারটি আঘাতেই সে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে। দুনিয়ার স্বার্থ যার মনে স্থান লাভ করে এ পথের যে কোনো সাফল্য কোনো না কোনো পর্যায়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনে।

চরিত্র মাধুর্য ঃ

চরিত্র মাধুর্য উপরোক্ত গুণটির প্রভাবকে কার্যতঃ একটি বিরাট বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করে। খোদার পথে যারা কাজ করে তাদের উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মতের অধিকারী হতে হবে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদী হতে হবে। তাদের হতে হবে ভদ্র ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাদের দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো ধারণাও যেন কেউ পোষন করতে না পারে এবং তাদের নিকট থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করবে। তারা নিজেদের প্রাপ্যের চাইতে কমের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতে প্রস্তুত থাকবে। তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেবে, অথবা কমপক্ষে মন্দ দিয়ে দেবে না। তারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলীর কদর করবে। তারা অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেবার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে, অন্যের দোষ-ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্যে কারোর উপর প্রতিশোধ নেবে না। তারা অন্যের সেবা গ্রহণ করে নয় বরং অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে। তারা নিজের স্বার্থে নয় বরং অন্যের ভালোর জন্যে কাজ করবে। কোনো প্রকার প্রশংসার অপেক্ষা না করে এবং কোনো প্রকার নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব

পালন করে যাবে। খোদা ছাড়া আর কারোর পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। তাদেরকে বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না। ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে তারা নির্দ্বিধায় ঝুঁকে পড়বে। তাদের শত্রুরাও তাদের ওপর এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোনো অবস্থায়ই তারা ভদ্রতা ও ন্যায়নীতি বিরোধী কোনো কাজ করবে না। এ চারিত্রিক গুণাবলী মানুষের মন জয় করে নেয়। এগুলো তলোয়ারের চাইতেও ধারালো এবং হীরা, মনি-মুক্তার চাইতেও মূল্যবান। যে এহেন চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনকারী সে তার চারপাশের জনবসতির ওপর বিজয় লাভ করে। কোনো দল পূর্ণাঙ্গরূপে এ গুণাবলীর অধিকারী হয়ে কোনো মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালালে দেশের পর দেশ তার করতলগত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না।

ধৈর্য ঃ

এই সংগে আর একটি গুণও সংযুক্ত আছে, তাকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলা যায়। সেটি হচ্ছে ধৈর্য। ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং খোদার পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়।

ধৈর্যের একটি অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্যে অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও জীবন পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। এটা নিছক ছেলের হাতের মোয়া নয়।

ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবে চিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সংকল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধৈর্যের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশ্‌ত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝন্‌ঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না।

দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়াও ধৈর্যের একটি অর্থ। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙ্গার কাজও করতে হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যি তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থির চিত্তে ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্যে বেহ্তর কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উঁচিয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনোদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এদিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে? এ পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজেদের কাপড়ে কোনো কাঁটা বিঁধলে কাপড়ের সে অংশটি ছিঁড়ে কাঁটাগাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে। কেবল বিরোধীদের মোকাবেলায় এ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় না বরং অনেক সময় এ পথের পথিকের নিজের সহযোগীদের তিক্ত ও বিরক্তিকর বাক্যবাণেও বিদ্ধ হতে হয় এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিলে সমগ্র কাফেলা পথভ্রষ্ট হতে পারে।

ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও খোদার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গোনাহর পথে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকী ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনাকে সাদরে বরণ করা। দুনিয়াপূজারীদের আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি লোভ না করা এবং এজন্যে সামান্য আক্ষেপ না করা। দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লক্ষ দানের উপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য।

উপরোক্ত সকল অর্থেই ধৈর্য হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের কাজের মধ্যে যে কোন দিক দিয়ে ধৈর্যহীনতা দেখা দিলে অবশ্য আমাদেরকে তার কুফলের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রজ্ঞা ঃ

এসব গুণের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কাজের বেশী সাফল্য এরি ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় যে সব জীবন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল লোকেরাই সেগুলো চালাচ্ছে। তাদের পেছনে ব্যক্তিগত উপায়-উপকরণের সাথে সাথে বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষমতাও কাজ করছে। এগুলোর মোকাবেলায় আর একটি জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা এবং সাফল্যের সাথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নেহায়েত ছেলেখেলা নয়। নিছক বিছমিল্লাহর গমবুজে যাদের বসবাস এ কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। সরলমনা, চিন্তা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিবর্জিত লোকেরা যতই সৎ নেক-দিল হোক না কেন, একাজ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হবার সম্ভাবনা নেই। এজন্যে গভীর দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে যারা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে। এসব গুণকেই এক কথায় প্রজ্ঞা বলা যায়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও প্রকাশের ওপর এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হচ্ছে মানবিক মনস্তত্ব অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী মানুষের সাথে ব্যবহার করা, এবং মানুষের মনের ওপর নিজের দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার করে তাকে লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত করার পদ্ধতি অবগত হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই পেটেন্ট ওষুধ না দিয়ে বরং প্রত্যেকের মেজাজ ও রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা। প্রত্যেককে একই লাঠি দিয়ে হাঁকিয়ে না দিয়ে বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, শ্রেণী ও দলের বিশেষ অবস্থা অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা।

নিজের কাজ ও তা সম্পাদন করার পদ্ধতি জানা এবং তার পথে আগত যাবতীয় বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা-বিরোধিতার মোকাবেলা করাও প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। তাকে নির্ভুলভাবে জানতে হবে যে, যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সে

প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সফল করার জন্যে তাকে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে এবং কোন্ ধরনের প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করতে হবে।

পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা, সময়–সুযোগ অনুধাবন করা এবং কোন্ সময়ে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, এসব জানাও প্রজ্ঞারই পরিচয়। অবস্থা না বুঝেই অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে দেয়া, অসময়োচিত কাজ করা, কাজের সময় ভুল করা গাফেল ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন লোকের কাজ। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে যতই সততা ও সৎ সংকল্পের সাথে কাজ করুকনা কেন তারা কোনো ক্রমেই কামিয়াব হতে পারে না।

দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও দুনিয়ার কাজ–কারবারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রজ্ঞার পরিচয়। নিছক শরীয়তের বিধিনিষেধ ও মাসায়েল অবগত হয়ে উপস্থিত ঘটনাবলীকে সে দৃষ্টিতে বিচার করা মুফ্তির জন্যে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু বিকৃত সমাজের সংশোধণ ও জীবন–ব্যবস্থাকে জাহেলিয়াতের ভিত্তি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে দ্বীনের ভিত্তিতে পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে বিধি–নিষেধের খুঁটিনাটি দিকের সাথে তার মূলগত দিকের (বরং পরিপূর্ণ দ্বীনি ব্যবস্থার) ওপর নজর রাখতে হবে। উপরন্তু বিধি–নিষেধের সাথে সাথে সেগুলোর কারণ, যৌক্তিকতা ও ফলাফল সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং যেসব সাময়িক পরিস্থিতি ও সমস্যাকে সে দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে সেগুলোও বুঝতে হবে।

অভিপ্সীত গুণাবলীর এ বিরাট ফিরিস্তি দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষ ভীত হয়ে পড়ে এবং চিন্তা করতে থাকে যে, আল্লাহ্র কামেল বান্দা ছাড়া তো এ কাজ আর কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এত বিচিত্র ও বিপুল গুণের সমাবেশ কেমন করে সম্ভব। এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে অবশ্যই একথা জানা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া সম্ভব নয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম পদক্ষেপেই তা পূর্ণ অনুশীলিত আকারে বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়। আমি একথা বলে বুঝাতে চাচ্ছি যে, যারা এ কাজ করতে অগ্রসর হবে তারা নিছক জাতি সেবার একটি কাজ মনে করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে না বরং নিজেদের মনোজগত পর্যালোচনা করে কাজ সম্পাদনের জন্যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন তার উপাদান তাদের মধ্যে আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করবে। উপাদান থাকলে কাজ শুরু করার জন্যে যথেষ্ট। তাকে লালন

করা ও নিজের সামর্থ অনুযায়ী যথাসম্ভব অধিক উন্নত করা পরবর্তী পর্যায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত। বীজ থেকে অঙ্কুরিত একটি ছোট্ট চারাগাছ মাটির গভীরে শিকড় পৌছিয়ে দেবার পর ধীরে ধীরে খাদ্য সংগ্রহ করে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। কিন্তু যদি বীজেরই অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেখানে কিছুই হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে অভিপ্সীত গুণাবলীর উপাদান যদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছতে পারে। কিন্তু যদি আদতে উপাদানই না থাকে তাহলে প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে কোনো প্রকার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে সংশোধন ও পরিগঠনের জন্যে একটি নির্ভুল কর্মসূচীর যতটা প্রয়োজন তার চাইতে কয়েকগুণ বেশী প্রয়োজন এ কাজের উপযোগী নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কর্মীদের। কারণ কোনো কর্মসূচীর দফাসমূহকে নয় বরং যে সব লোক কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে অগ্রসর হয় তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্রকেই অবশেষে সমাজ এবং সমষ্টির সাথে সংঘর্ষশীল ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাই কোন কর্মসূচী ও প্রোগ্রাম স্থির করার পূর্বে কাজের জন্যে কোন্ ধরনের কর্মীর প্রয়োজন, তাদের কোন্ গুণাবলী সমন্বিত হতে হবে ও কোন্ ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং এ ধরনের কর্মী তৈরী করার উপায় কি, এ সম্পর্কে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার পর আমি অভিপ্সাত গুণাবলীকে তিন অংশে

প্রথমত ঃ কাজের ভিত্তি হিসেবে এ কাজে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সব গুণ থাকা উচিৎ সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) দ্বীনের নির্ভুল জ্ঞান;

(২) তার প্রতি অটুট বিশ্বাস;

(৩) সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন ও কর্ম সম্পাদন;

(৪) তাকে প্রতিষ্ঠিত করাকে নিজের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা।

দ্বিতীয়ত ঃ যে দল এ কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয় তার মধ্যে যে সব গুণ থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) পারস্পরিক ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি সুধারণা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা ও পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার;

(২) সংগঠন, শৃংখলা, সুসংবদ্ধতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা ও টীমস্পিরীট;

(৩) পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা এবং পরামর্শের ইসলামী নীতি পদ্ধতির প্রতি নজর রাখা।

(৪) সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা, এ সমালোচনা হতে হবে ভদ্রতার সাথে, যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে, যার ফলে দলের মধ্যে সৃষ্ট অসৎ গুণাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে যথাসময়ে তার অপনোদন সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত ঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করার ও তাকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাবার জন্যে যে সব গুণ অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও তার সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করা;

(২) আখেরাতের জবাবদিহিকে স্মরণ রাখা এবং আখেরাতের পুরস্কার ভিন্ন অন্য কিছুর প্রতি নজর না দেয়া;

(৩) চরিত্র মাধুর্য;

(৪) ধৈর্য;

(৫) প্রজ্ঞা।

এখন আমি এ মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্রতী ব্যক্তিবর্গকে যেসব অসৎ গুণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত সেগুলো আলোচনা করবো।

মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী

গর্ব ও অহঙ্কার ঃ

সমস্ত সদ্‌গুণের মূলোৎপাটনকারী প্রধানতম ও সবচাইতে মারাত্মক অসৎ গুণ হচ্ছে গর্ব অহংকার, আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। এটি একটি শয়তানী প্রেরণা এবং শয়তানী কাজেরই উপযোগী হতে পারে। শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত। (তাই এই অসৎগুণ সহকারে কোনো সৎকাজ করা যেতে পারে না।) বান্দার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি বা দল এ মিথ্যা গর্ব–অহংকারে লিপ্ত থাকে সে খোদার সব রকমের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ খোদা নিজের বান্দার মধ্যে এ ত্রুটিই সবচাইতে বেশী অপছন্দ করেন। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোনোক্রমেই সঠিক পথ লাভ করতে পারে না। সে অনবরত মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকে। এভাবে অবশেষে ব্যর্থতার সমুখীন হয়। ফলে মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে যতই গর্ব ও অহংকারের প্রকাশ করে ততই তার বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এমনকি অবশেষে সে মানুষের চোখে ঘৃণিত হয়ে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যার ফলে মানুষের ওপর তার কোনো নৈতিক প্রভাব কায়েম থাকে না।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন পথে এ রোগটি অনুপ্রবেশ করে। সংকীর্ণমনা লোকদের মনে এ রোগটি একটি বিশেষ পথে অনুপ্রবেশ করে। যখন আশেপাশের দ্বীনি ও নৈতিক অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে ওঠে এবং তারা কিছু উল্লেখযোগ্য জনসেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে, ফলে অন্যের মুখেও তার স্বীকৃতি শুনা যায়, তখন শয়তান তাদের দিলে ওয়াস্‌–ওয়াসা পয়দা করতে থাকে যে, সত্যিই তোমরা মহাবুজর্গ হয়ে গেছো। শয়তানের প্ররোচনায়ই তারা স্বমুখে ও স্বকীয় কার্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে সৎকাজের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজের সূচনা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ভুল পথে অগ্রসর হয়। এ রোগের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে যারা সদিচ্ছা সহকারে নিজের ও মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে অবশ্য কিছু না কিছু সদ্‌গুণাবলী সৃষ্টি হয়, কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা নিজেদের

সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং তাদের কিছু না কিছু জনসেবামূলক কাজ উল্লেখ্য হয়। এগুলো সমাজের প্রশস্ত অংগনে প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠিত হবার কারণে অবশ্য মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এগুলো দৃষ্টি গোচর হওয়াই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কিন্তু মনের লাগাম সামান্য ঢিলে হয়ে গেলেই শয়তানের সফল প্ররোচনায় তা অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়। আবার অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে তাদের বিরোধীরা যখন তাদের কাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার গলদ আবিষ্কারের চেষ্টা করে তখন বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার তাকীদে তাদের কিছু না কিছু বলতে হয়। তাদের বলা ঘটনাভিত্তিক ও বাস্তব সত্য হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে নিজের গুণাবলীর প্রকাশ অবশ্যই থাকে। একটু সামান্য ভারসাম্যহীনতা এ বস্তুটিকে বৈধ সীমা ডিঙিয়ে গর্বের সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। এটি একটি মারাত্মক বস্তু। প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে এ সম্পর্কে সজাগ থাকা উচিত।

বাঁচার উপায় ঃ

বন্দেগীর অনুভূতি ঃ যারা আন্তরিকতার সাথে সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে অবশ্য বন্দেগীর অনুভূতি নিছক বিদ্যমান নয় বরং জীবিত ও তাজা থাকা উচিৎ। তাদের কখনো এ নির্জলা সত্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ একমাত্র খোদার সত্তার সাথে বিশেষিত। খোদার তুলনায় অসহায়তা ও দীনতা, অক্ষমতা ছাড়া বান্দার দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই। কোনো বান্দার মধ্যে যদি সত্যিই কোনো সদগুণের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা খোদার মেহেরবানী, তা গর্বের ও অহংকারের নয় বরং কৃতজ্ঞতার বিষয়। এ জন্যে খোদার কাছে আরো বেশী করে দীনতা প্রকাশ করা উচিত এবং এ সামান্য মূলধনকে সৎকর্মশীলতার সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। এর ফলে খোদা আরো মেহেরবানী করবেন এবং এ মূলধন ফুলে ফেঁপে উঠবে। সদগুণ সৃষ্টি হবার পর অহংকারে মত্ত হওয়া আসলে তাকে অসদগুণে পরিবর্তিত করার নামান্তর। এটি উন্নতি নয়, অবনতির পথ।

আত্মবিচার ঃ বন্দেগীর অনুভূতির পর দ্বিতীয় যে বস্তুটি মানুষকে অহংকার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে সেটি হচ্ছে আত্মবিচার। যে ব্যক্তি নিজের সদগুণাবলী অনুভব করার সাথে সাথে নিজের দুর্বলতা, দোষ ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোও দেখে সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের

গোনাহ্ ও দোষ-ত্রুটির প্রতি যার নজর থাকে, এস্তেগফার করতে করতে অহংকার করার কথা চিন্তা করার মতো অবকাশ তার থাকে না।

মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি : আর একটি বস্তু এই ক্ষতিকর প্রবণতা রোধ করতে পারে। তাহলো কেবল নিজের নীচের তলার দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, যাদের চাইতে সে নিজেকে বুলন্দ ও উন্নত প্রত্যক্ষ করে আসছে। বরং তাকে দ্বীন ও নৈতিকতার উন্নত ও মূর্ত প্রতীকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যাদের চাইতে সে এখনো অনেক নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ন্যায় অবনতিও সীমাহীন। সবচাইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও যদি নীচের দিকে তাকায় তাহলে কাউকে নিজের চাইতেও দুষ্ট ও অসৎ দেখে নিজের উন্নত অবস্থার জন্যে গর্ব করতে পারে। এ গর্বের ফলে সে নিজের বর্তমান অবস্থার ওপর নিশ্চিত থাকে এবং নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। বরং এর চাইতেও আরো আগে অগ্রসর হয়ে মনে শয়তানী প্রবৃত্তি তাকে আশ্বাস দেয় যে, এখনো আরো কিছুটা নীচে নামবার অবকাশ আছে। এ দৃষ্টিভংগী একমাত্র তারাই অবলম্বন করতে পারে যারা নিজেদের উন্নতির দুশমন। যারা উন্নতির সত্যিকার আকাঙ্খা পোষণ করে তারা নীচে তাকাবার পরিবর্তে হামেশা ওপরের দিকে তাকায়। উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে উপনীত হয়ে তাদের সামনে আরো উন্নতির পর্যায় দেখা দেয়। সেগুলো প্রত্যক্ষ করে গর্বের পরিবর্তে নিজের অবনতির অনুভূতি তাদের দিলে কাঁটার মতো বিঁধে। এ কাঁটার ব্যথা তাদেরকে উন্নতির আরো উচ্চমার্গে আরোহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দলগত প্রচেষ্টা : এই সঙ্গে দলকে হরহামেশা এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ও নিজের সমগ্র পরিসরে সকল প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রকাশ সম্পর্কে অবগত হয়ে যথা সময়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যেন এমন পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় যার ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম দীনতা ও নগণ্যতার প্রদর্শনী করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। আত্মম্ভরিতার গায়ে কৃত্রিম দীনতা-হীনতার পর্দা চড়িয়ে রাখার মতো মারাত্মক অহংকার আর নেই।

প্রদর্শনেচ্ছা :

আর একটি অসৎগুণ অহংকারের চাইতেও মারাত্মকভাবে সৎকাজকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তা হলো প্রদর্শনেচ্ছা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা দল লোক

দেখানোর জন্যে, মানুষের প্রশংসো কুড়াবার উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করলে তা এ পর্যায়ে উপনীত হয়। এ বস্তুটি কেবল আন্তরিকতারই নয় আসলে ঈমানেরও পরিপন্থী এবং এ জন্যেই একে প্রচ্ছন্ন শিরক গণ্য করা হয়েছে। খোদা ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কাজ করবে, একমাত্র তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশা পোষণ করবে এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্যে পরিণত করে, মানুষের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করতে চায়। এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ সে মানুষকে খোদার শরীক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছে। বলাবাহুল্য, এ অবস্থায় মানুষ খোদার দ্বীনের যে পরিমাণ ও পর্যায়ের খেদমত করুক না কেন, তা কোনো ক্রমেই খোদার জন্যে ও দ্বীনের জন্যে হবে না এবং খোদার নিকট তা কখনোই সৎকাজ রূপেও গৃহীত হবে না।

এ ক্ষতিকর প্রবণতাটি যে কেবল ফলাফলের দিক থেকেই কর্মকে নষ্ট করে তা নয় বরং এ প্রবণতা সহকারে কোনো যথার্থ কাজ করাও সম্ভব নয়। এ প্রবণতার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষ কাজের চাইতে কাজের বিজ্ঞাপনের চিন্তা করে বেশী। দুনিয়ায় যে কাজের ঢাকঢোল পিটানো হয় এবং যেটি মানুষের প্রশংসা অর্জন করে সেটিকেই সে কাজ মনে করে। যে নীরব কাজের খবর খোদা ছাড়া আর কেউ রাখে না সেটি তার কাছে কোনো কাজ বলে মনে হয় না। এভাবে মানুষের কাজের পরিমন্ডল কেবল প্রচারযোগ্য কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর ঐ কাজগুলোর প্রতি আর কোনো প্রকার আকর্ষণ থাকে না। যতই আন্তরিকতার সাথে বাস্তব কার্যারম্ভ করা হোক না কেন এ রোগে আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই যক্ষারোগে জীবনীশক্তি ক্ষয় হওয়ার ন্যায় মানুষের আন্তরিকতা অন্তর্হিত হতে থাকে। অতঃপর লোকচক্ষুর বাইরেও সৎভাবে অবস্থান করা এবং নিজের কর্তব্য মনে করে কোনো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে প্রত্যেক বস্তুকে লোক দেখানো মর্যাদা ও মৌখিক প্রশংসায় মূল হিসেবে বিচার করে। প্রতিটি কাজে সে দেখে মানুষ কোনটা পছন্দ করে। ঈমানদারীর সাথে তার বিবেক কোনো কাজে সায় দিলেও যদি সে দেখে যে, এ কাজটি দুনিয়ায় তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেবে তাহলে তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঘরের কোণে বসে যারা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে তাদের জন্যে এ ফেত্‌না থেকে মুক্ত থাকা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু যারা বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং সংশোধন, জনসেবা ও সমাজ গঠনমূলক কাজ করে তারা হররহামেশা এই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। যে কোন সময় এ নৈতিক যক্ষার জীবানু তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় এমন বহু কাজ তাদের জনগণকে নিজেদের পক্ষাবলম্বী ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হয়। যেগুলোর কারণে মানুষ তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয়। তাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে নিজেদের ভালো কাজগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হয়। এ অবস্থায় খ্যাতির সাথে খ্যাতির মোহ না থাকা, কাজের প্রদর্শনী সত্ত্বেও প্রদর্শনেচ্ছা না থাকা, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেটি লক্ষ্যে পরিণত না হওয়া, মানুষের প্রশংসোবাণী পাওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের চিন্তা বা আকাঙ্খা না করা চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রয়োজন। সামান্যতম গাফলতিও এ ব্যাপারে প্রদর্শনেচ্ছার রোগ–জীবাণুর অনুপ্রবেশের পথ করতে পারে।

এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় ধরনের প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা : ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে তার পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংগোপনে চুপে চুপে কিছু না কিছু সৎকাজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজের মনোজগত বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, সে ঐ গোপন সৎকাজগুলোর ও জনসমক্ষে প্রকাশিত সৎকাজগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলোর ব্যাপারে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে। যদি দ্বিতীয়টির সাথে অধিক আকর্ষণ অনুভূত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হওয়া দরকার যে, প্রদর্শনেচ্ছা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এবং এজন্যে খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দৃঢ় সংকল্প হয়ে মনের এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

সামষ্টিক প্রচেষ্টা : সামষ্টিক প্রচেষ্টার পদ্ধতি হচ্ছে, দল নিজের সীমানার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছাকে কোন প্রকারে ঠাঁই দেবে না। কাজের প্রকাশ ও প্রচারকে যথার্থ প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রদর্শনেচ্ছার সামান্যতম প্রভাবও যেখানে অনুভূত হবে সেখানে তৎক্ষণাৎ তার পথ রোধ করবে। দলীয় পরামর্শ ও আলোচনা কখনো

এমণ খাতে প্রবাহিত হবে না যে, অমুক কাজ করলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাবে কাজেই কাজটি করা উচিৎ বা অমুক কাজ লোকেরা পছন্দ করে কাজেই ঐ কাজটি করা প্রয়োজন। দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমন হতে হবে যার ফলে মানুষের প্রশংসো ও নিন্দাবাদের পরোয়া না করে কাজ করার মতো মানসিকতা সেখানে সৃষ্টি হয় এবং নিন্দাবাদের ফলে ভেংগে পড়ার ও প্রশংসো শুনে নবোদ্যমে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা লালিত না হয়। এ সত্ত্বেও যদি দলের মধ্যে প্রদর্শনী করার মনোবৃত্তিসম্পন্ন কিছু লোক পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাদের রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত ঃ

তৃতীয় মৌলিক দোষ হচ্ছে নিয়তের গলদ। এর ওপর কোনো সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। সৎকাজের প্রসার ও সে জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে খোদার নিকট সফলকাম হওয়ার আন্তরিক ও পার্থিব স্বার্থ বিবর্জিত নিয়তের মাধ্যমেই কেবল মাত্র দুনিয়ায় কোনো সৎকাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ নিয়তের সাথে নিজের কোনো ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। কোনো পার্থিব স্বার্থ এর সাথে মিশ্রিত থাকতে পারবে না। এমনকি কোনো প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সৎকাজের এ উদ্দেশ্যের সাথে নিজের জন্যে কোনো লাভের আশা জড়িত থাকতে পারবে না। এ ধরনের স্বার্থপ্রীতি কেবল খোদার নিকট মানুষের প্রাপ্য নষ্ট করে দেবে না বরং এ মনোবৃত্তি নিয়ে দুনিয়াতেও কোনো যথার্থ কাজ করা যাবে না। নিয়তের ত্রুটির প্রভাব অবশ্যই কাজের ওপর পড়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ নিয়ে এমন কোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দকে খতম করে ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইতিপূর্বে যে অসুবিধার কথা বলেছি এখানেও আবার তার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আংশিক সৎকাজ করার সময় নিয়তকে ত্রুটিমুক্ত রাখা। বেশী কঠিন নয়। সামান্য পরিমাণ খোদার সাথে সম্পর্ক ও সাচ্চা প্রেরণা এজন্যে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যারা সমগ্র দেশের জীবনব্যবস্থা সংশোধন করার এবং সামগ্রিকভাবে তাকে ইসলাম নির্দেশিত ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে কেবলমাত্র চিন্তা পরিগঠন বা প্রচার-প্রপাগান্ডা অথবা চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতে পারে না। বরং এই সঙ্গে তাদেরকে অবশ্য নিজেদের উদ্দেশ্যের দিকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মোড়

পরিবর্তনের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এভাবে ক্ষমতা সরাসরি তাদের হাতে আসে অথবা এমন কোন দলের হাতে স্থানান্তরিত হয় যে তাদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ দু'টি অবস্থার যে কোনো একটিতেও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার কথা চিন্তা করা যেতে পারে না। ব্যাপারটি এখন সমুদ্র গর্ভে অবস্থান করে গায়ে পানি না লাগাতে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোনো দল পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এ কাজ করবে এবং এরপরও তার সদস্যদের ব্যক্তিগত নিয়ত ও সমগ্র দলের সামষ্টিক নিয়ত ক্ষমতার লোভ বিমুক্ত থাকবে, এজন্যে কঠিন আত্মিক পরিশ্রম ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করার জন্যে দু'টি আপাতঃ সামঞ্জস্যশীল বস্তুর সূক্ষ্ম পার্থক্য ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। বলাবাহুল্য, অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে যারা এই পরিবর্তন চায় ক্ষমতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেইসব সমগ্র জীবনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াসী ব্যক্তির দিকে বা তাদের পছন্দসই লোকদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যারা নিজেদের জন্যে ক্ষমতা চায় আর যারা নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্যে ক্ষমতা চায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব কার্যত নীতি ও আদর্শের বাহকদের কর্তৃত্ব হলেও নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব চাওয়া এবং তার বাহকদের নিজেদের জন্যে কর্তৃত্ব চাওয়া আসলে দু'টি আলাদা বস্তু। এ উভয়ের মধ্যে প্রেরণা ও প্রাণবস্তুর দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়ে-গেছে। নিয়তের ত্রুটি দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে, প্রথমটির মধ্যে নেই। আর প্রথম বস্তুটির জন্যে মরণপণ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দ্বিতীয় বস্তুটির সামান্যতম গন্ধও মনের মধ্যে প্রবেশ করবে না, এজন্যে কঠোর আত্মিক পরিশ্রম করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁরা সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। এজন্যে রাজনৈতিক বিজয় ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ এছাড়া দ্বীনকে পুরোপুরি বিজয়ী করা সম্ভব ছিল না। আর কার্যত এ প্রচেষ্টার ফলে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাতে আসলেও কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে ক্ষমতা হস্তগত করা তাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব চেয়েছিল তাদের দৃষ্টান্ত ও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ দৃষ্টান্ত তালাশ করার জন্যে ইতিহাসের পাতা ওলটাবারই বা কি প্রয়োজন, আমাদের চোখের সামনেই তাদের অনেকেই

ঘুরে–ফিরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে কর্তৃত্ব লাভ করাকে যদি নিছক একটি ঘটনা হিসেবে বিচার করা হয় তাহলে উভয় দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না। কিন্তু নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের কাজ, প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামী যুগের কাজ ও সাফল্য যুগের কাজও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

যারা সাচ্চা দিলে ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবনব্যবস্থায় সার্বিক কর্তৃত্ব চায় তাদের ব্যক্তিগতভাবেও এ পার্থক্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিজেদের নিয়ত ঠিক রাখা উচিত। এবং তাদের দলেরও সামগ্রিকভাবে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যাশা কোনো অবস্থায়ও এর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে না পারে।

মানবিক দুর্বলতা

এরপর এমন কতকগুলো দোষত্রুটি আছে যেগুলো ভিত্তিমূলকে ধ্বসিয়ে না দিলেও নিজের প্রভাবের দিক দিয়ে কাজকে বিকৃত করে থাকে এবং গাফলতির দরুণ এগুলো লালিত হতে থাকলে ধ্বংসকর প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শয়তান সৎকাজের পথ রোধ করে, মানবিক প্রচেষ্টাকে ভালোর থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সমাজ দেহের সুস্থতার জন্যে সর্বাবস্থায় এ দোষগুলোর পথ রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে সমাজ সংশোধন ও সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্রতী ব্যক্তি ও দলের এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা উচিত।

এ দোষগুলোর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, এগুলোর উৎসমূল মানুষের এমন কতিপয় দুর্বলতা যার প্রত্যেকটিই অসংখ্য দোষের জন্ম দেয়। বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে হলে এক একটি দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করে তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। অতঃপর তা কিভাবে পর্যায়ক্রমে অসৎ কাজের জন্ম দেয় এবং তার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধন করে কোন্ কোন্ দোষত্রুটির সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক দোষের উৎসে আমরা জানতে পারবো এবং তার সংশোধনের জন্যে কোথায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাও নির্ণয় করতে সক্ষম হবো।

আত্মপূজা ঃ

মানুষের সকল দুর্বলতার মধ্যে সবচাইতে বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্বলতা হচ্ছে 'স্বার্থপূজা'। এর মূলে আছে আত্মপ্রীতির স্বাভাবিক প্রেরণা। এ প্রেরণা যথার্থ পর্যায়ে দোষণীয় নয় বরং নিজের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অপরিহার্য এবং উপকারীও। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে তার ভালোর জন্যে এ প্রেরণা উজ্জীবিত রেখেছেন। এর ফলে সে নিজের সংরক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু শয়তানের উস্কানীতে যখন এ প্রেরণা আত্মপূজা ও

আত্মকেন্দ্রীকতায় রূপান্তরিত হয় তখন তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের উৎসে পরিণত হয়। তারপর এর অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়ে নতুন নতুন দোষের জন্ম হতে থাকে।

আত্মপ্রীতি ঃ

মানুষ যখন নিজেকে ত্রুটিহীন ও সমস্ত গুণাবলীর আধার মনে করে নিজের দোষ ও দুর্বলতার অনুভূতিকে ঢাকা দেয় এবং নিজের প্রতিটি দোষ–ত্রুটির ব্যাখ্যা করে নিজেকে সবদিক দিয়ে ভালো বলে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করে, তখন এ আত্মপ্রীতির প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এ আত্মপ্রীতি প্রথম পদক্ষেপেই তার সংশোধন ও উন্নতির দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেয়।

অতঃপর যখন 'আমি কত ভালো' এ অনুভূতি নিয়ে মানুষ সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখন সে নিজেকে যা মনে করে রেখেছে অন্যরাও তাকে তাই মনে করুক এ আকাংখা তার মনে জাগে। সে কেবল প্রশংসা শুনতে চায়। সমালোচনা তার নিকট পছন্দনীয় হয় না। তার নিজের কল্যাণার্থে যে কোনো উপদেশবাণীও তার অহমকে পীড়িত করে। এভাবে এ ব্যক্তি নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ উপায়–উপকরণের সাথে সাথে বাইরের উপায়–উপকরণেরও পথ রোধ করে।

কিন্তু সমাজ জীবনে সকল দিক দিয়ে নিজের আশা–আকাংখা অনুযায়ী পছন্দসই অবস্থা লাভ করা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির জন্যে সম্ভবপর হয় না। বিশেষ করে আত্মপ্রেমিক ও আত্মপূজারী তো এখানে সর্বত্রই ধাক্কা খায়। কারণ তার অহম নিজের মধ্যে এমন সব কার্যকারণ উপস্থিত করে, যা সমাজের অসংখ্য গুণাবলীর সাথে তার সংঘর্ষকে অপরিহার্য করে তোলে। অন্যদিকে সমাজের সামগ্রিক অবস্থাও তার আশা–আকাংখার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। এ অবস্থা ঐ ব্যক্তিকে কেবল নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের উপায়–উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে না বরং এই সঙ্গে অন্যের সাথে সংঘর্ষ ও আশা–আকাংখার পরাজয়ের দুঃখ তার আহত ও বিক্ষুব্ধ অহমকে একের পর এক মারাত্মক অসৎ কাজের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। সে জীবনে অনেক লোককে নিজের চাইতে ভালো দেখে। অনেক লোকের ব্যাপারে সে মনে করে, সমাজ তাদেরকে তার চাইতে বেশী দাম দেয়। সে নিজে যে মর্যাদার প্রত্যাশী অনেক লোক তাকে তা দেয় না। সে নিজেকে যে সব মর্যাদার হক্‌দার মনে করে সে পর্যন্ত পৌঁছার পথে অনেক লোক তার জন্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক লোক তার সমালোচনা করে এবং তার মর্যাদাহানী করে। এ ধরনের বিচিত্র

অবস্থা তার মনে বিভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে অন্যের অবস্থা অনুসন্ধান করে, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, গীবত করে, গীবত শুনে তার স্বাদ গ্রহণ করে, চোগলখুরী করে, কানাকানি করে এবং ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়। আর যদি তার নৈতিকতার বাঁধন ঢিলে হয়ে থাকে অথবা অনবরত ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকার কারণে ঢিলে হয়ে যায়, তাহলে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে মিথ্যা দোষারোপ, অপপ্রচার প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ করে বসে। এ সমস্ত অসৎ কাজ সম্পাদন করতে করতে সে নৈতিকতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে যায়। তবে যদি কোনো পর্যায়ে পৌছে সে নিজের এ প্রারম্ভিক ভ্রান্তি অনুভব করতে পারে, যা তাকে এ পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে। তাহলে সে এ পতন থেকে বাঁচতে পারে।

কোনো এক ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হলে কোনো প্রকার সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় না। এর প্রভাব বড় জোর কয়েক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। তবে যদি সমাজে বহু আত্মপূজার রোগীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবে সমগ্র সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়। বলাবাহুল্য, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কু–ধারণা, গোয়েন্দা মনোবৃত্তি, পরদোষ অনুসন্ধান, গীবত ও চোগলখুরীর দীর্ঘ সিলসিলা চলতে থাকে, সেখানে অনেক লোক মনের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসৎবৃত্তি লালন করে এবং হিংসা ও পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেখানে অনেক আহত অহং প্রতিরোধ স্পৃহায় ভরপুর থাকে, সেখানে কোনো বন্ধু গ্রুপ সৃষ্টির পথ রোধ করতে পারে না। সেখানে কোনো প্রকার গঠনমূলক সহযোগিতা দূরের কথা মধুর সম্পর্কের সম্ভাবনাই থাকে না। এহেন পরিবেশে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ আত্মপূজার রোগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ধীরে ধীরে ভালো ভালো সৎলোকেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ সৎ ব্যক্তি তার মুখের ওপর যথার্থ সমালোচনাই নয় অযথার্থ সমালোচনাও বরদাশ্‌ত করতে পারে কিন্তু গীবত তার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এর কমপক্ষে এতটুকু প্রভাব পড়ে যে, গীবতকারীর ওপর আস্থা স্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে কোন্ সৎ ব্যক্তি হিংসা বিদ্বেষের ভিত্তিতে তার প্রতি যে সমস্ত বাড়াবাড়ি করা হয় সেগুলো মাফ করতে পারে। সে গালিগালাজ, দোষারোপ, মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও এর চাইতে অধিক কষ্টদায়ক জুলুম উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু যেসব লোকেরা এহেন অসৎ গুণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়েছে তাদের সাথে নিশ্চিত হয়ে কোনো কারবার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে

যে এ অসৎ গুণাবলী যে সামাজিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করে তা কিভাবে শয়তানের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এমনকি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সৎব্যক্তিত্ব সংঘর্ষ মুক্ত থাকলেও দ্বন্দ্বমুক্ত থাকতে পারে না।

অতঃপর যারা সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের জন্যে সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে চায় তাদের দলের যে এহেন অসৎ ব্যক্তিদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া অপরিহার্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে আত্মপূজা এ ধরনের দলের জন্যে কলেরা ও বসন্তের জীবাণুর চাইতেও অনেক বেশী ক্ষতিকর। এর উপস্থিতিতে কোনো প্রকার সৎকাজ ও সংশোধনের চিন্তাই করা যায় না।

বাঁচার উপায় ঃ

তওবা ও এস্তেগফার ঃ

ইসলামী শরীয়ত এ রোগটি শুরু হবার সাথে সাথেই এর চিকিৎসা শুরু করে দেয়। অতঃপর প্রতিটি পর্যায়ে এর পথ রোধ করার জন্যে নির্দেশ দান করতে থাকে। কুরআন ও হাদীসের স্থানে স্থানে ঈমানদারদেরকে তওবা ও এস্তেগফার করার জন্যে উপদেশ দান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুমিন যেন কোনো সময় আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতির রোগে আক্রান্ত না হয়, কখনো আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত না হয়, নিজের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি অনুভব এবং ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করতে থাকে ও কোনো বিরাট কাজ করার পরও অহংকারে বুক ফুলাবার পরিবর্তে দীনতার সাথে নিজের খোদার সম্মুখে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, তার খেদমতের মধ্যে যে গলদ রয়ে গেছে সেগুলো যেন মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সঃ) চাইতে বড় পূর্ণতার অধিকারী আর কে হতে পারে? কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় তার চাইতে বড় কাজ সম্পাদন করেছে? কিন্তু ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম কাজ সম্পাদন করার পর আল্লাহ তায়ালার দরবার থেকে তাঁকে যে নির্দেশ দেয়া হলো তা হচ্ছেঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায় আর তুমি মানুষকে দলে দলে খোদার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছো তখন নিজের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ

তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট মাগফেরাত চাও অবশ্য তিনি তওবা কবুলকারী।"

অর্থাৎ যে মহান কাজ তুমি সম্পাদন করেছো সে সম্পর্কে জেনে রেখো, তার জন্যে তোমার নয়, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা প্রাপ্য। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ মহান কাজ সম্পাদনে সফলকাম হয়েছো এবং নিজের সম্পর্কে তোমার এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, যে কাজ তুমি সম্পাদন করেছো তা যথাযথ ও পূর্ণতার সাথে সম্পাদিত হয়নি। তাই পুরস্কার চাওয়ার পরিবর্তে কাজের মধ্যে যা কিছু অপূর্ণতা ও গলদ রয়ে গেছে তা মাফ করার জন্যে নিজের প্রতিপালকের নিকট দোয়া করো। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে প্রায়ই বলতেন, আমি খোদার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি খোদার কাছে মাগফেরাত চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি।"

এমনিতেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) হামেশা তওবা ও এস্তেগফার করতেন। বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ

وَاللّٰهِ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

"খোদার কসম আমি প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট এস্তেগফার ও তওবা করি।"

এ শিক্ষার প্রাণবস্তুকে আত্মস্থ করার পর কোন ব্যক্তির মনে আত্মপূজার বীজ অংকুরিত হতে পারবে না এবং তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিতেও সক্ষম হবেনা।

সত্যের প্রকাশ ঃ

এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত চরিত্র ও কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতি পদে পদে এর বিকাশ ও প্রকাশের পথ রোধ করে এবং এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়। যেমন এর প্রথম প্রকাশ এভাবে হয়ে থাকে যে, মানুষ নিজেকে সমালোচনার উর্ধে মনে করে এবং নিজের কথা ও মতামতের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। অন্য কোনো ব্যক্তি তার ভুলের সমালোচনা করবে, এটা সে বরদাশ্‌ত করে না। বিপরীত পক্ষে ইসলামী শরীয়ত সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সকল ঈমানদারদের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন জালেমদের সম্মুখে সত্যের প্রকাশকে সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছে। এভাবে মুসলিম সমাজে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ও সৎকাজের নির্দেশ দেবার উপযোগী এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে আত্মপূজা স্থান লাভ করতে পারে না।

হিংসা ও বিদ্বেষ ঃ

আত্মপূজার দ্বিতীয় প্রকাশ হয় হিংসা ও বিদ্বেষের রূপে। আত্মপূজার আত্মপ্রীতিতে যে ব্যক্তি আঘাত হানে তার বিরুদ্ধেই মানুষ এ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। অতঃপর তার সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ইসলামী শরীয়ত একে গোনাহ্‌ গণ্য করে এ গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"সাবধান। হিংসা করো না।, কারণ হিংসা মানুষের সৎকাজগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন শুক্‌নো কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

হাদীসে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সঃ) এ কঠোর নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছেঃ "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পরের সাথে কথা বলা বন্ধ করো না, কোনো মুসলমানের জন্যে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা বৈধ নয়।"

কু—ধারণা ঃ

আত্মপূজার তৃতীয় প্রকাশ হয় কু-ধারণার মাধ্যমে। কু-ধারণা সৃষ্টি হবার পর মানুষ গোয়েন্দা মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে থাকে। কু-ধারণার

তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ নিজের ছাড়া অন্য সবার সম্পর্কে এ প্রাথমিক ধারণা রাখে যে, তারা সবাই খারাপ এবং বাহ্যতঃ তাদের যে সমস্ত বিষয় আপত্তিকর দেখা যায় সেগুলোর কোনো ভালো ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে হামেশা খারাপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনো প্রকার অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন বোধ করে না। গোয়েন্দাগিরি এ কু-ধারণারই একটি ফসল। মানুষ অন্যের সম্পর্কে প্রথমে একটি খারাপ ধারণা করে। অতঃপর তার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে ঐ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে থাকে। কুরআন এ দুটি বস্তুকেই গোনাহ্ গণ্য করেছে।

সুরায়ে হুজুরাতে আল্লাহ বলেছেনঃ

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

"অনেক বেশী ধারণা করা থেকে দূরে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা গোনাহের পর্যায়ভুক্ত, আর গোয়েন্দাগিরি করো না।"

রাসূলুল্লা (সঃ) বলেছেনঃ "সাবধান! কু-ধারণা করো না, কারণ কু-ধারণা মারাত্মক মিথ্যা" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ "আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি করতে ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোনো কথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমরা পাকড়াও করবো।" হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুলাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা মুসলমানদের গোপন অবস্থার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে থাকলে তাদেরকে বিগড়িয়ে দেবে।"

গীবত ঃ

এ সকল পর্যায়ের পর শুরু হয় গীবতের পর্যায়। কু-ধারণা বা যথার্থ সত্য যার উপরই এর ভিত প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং লাঞ্ছনা দেখে মনে আনন্দ অনুভব করা বা তা থেকে নিজে লাভবান হবার জন্যে তার অসাক্ষাতে তার দুর্নাম করার নাম গীবত। হাদীসে এর সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কথা এমনভাবে বলা, যা সে জানতে পারলে অপছন্দ করতো। রাসূলুল্লাহ্কে (সঃ) জিজ্ঞেস

করা হলোঃ 'যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে তাহলে ও কি তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে? জবাব দিলেন 'যদি তার মধ্যে ঐ দোষ থেকে থাকে এবং তুমি তা বর্ণনা করে থাক, তাহলে তুমি গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে ঐ দোষ না থেকে থাকে তাহলে তুমি গীবত থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করলে।" কুরআন একে হারাম গণ্য করেছে। সূরায়ে হুজুরাতে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ -

"আর তোমাদের কেউ কারোর গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয় তোমরা তা ঘৃণা করবে।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু অন্য মুসলমানের জন্যে হারাম।" এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, যখন কারোর দুর্নাম করার নিয়ত সামিল না থাকে। যেমন কোনো মজলুম যদি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কুরআনে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ -

"আল্লাহ অসৎ কাজ সম্পর্কে কথা বলা পছন্দ করেন না, তবে যদি কারোর ওপর জুলুম হয়ে থাকে।"

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় বা তার সাথে কোনো কারবার করতে চায় এবং এ ব্যাপারে একপক্ষ কোনো পরিচিত জনের নিকট পরামর্শ চাইলে ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্যিকার কোনো দোষ যদি তার জানা থাকে তাহলে কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা বর্ণনা করা কেবল বৈধই নয় বরং অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও এসব ক্ষেত্রে দোষত্রুটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, "দুই ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে কায়েসের নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠালে তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সাথে পরামর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দেন যে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে অভাবী এবং দ্বিতীয়জন স্ত্রীকে প্রহার করতে অভ্যস্ত।"

অনুরূপভাবে শরীয়তে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে তাদের দোষসমূহ বর্ণনা করাকে আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ কার্যতঃ এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। কারণ দ্বীনের জন্যে এর প্রয়োজন ছিল। যারা মানুষের ওপর প্রকাশ্যে জুলুম করে, অনৈতিক ও ফাসেকী কাজ কর্মের প্রসার ঘটায় এবং প্রকাশ্যে অসৎ কাজ করে বেড়ায় তাদের গীবত করাও বৈধ। রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নিজের কাজ থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী সর্বাবস্থায়ই গীবত করা হারাম এবং তা শুনাও গোনাহ্‌। শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, গীবতকারীকে বাধা দেয়া, অন্যথায় যার গীবত করা হচ্ছে তাকে বাঁচান, আর নয় তো সর্বশেষ পর্যায়ে যে মাহ্‌ফিলে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে উঠে যাওয়া।

চোগলখোরীঃ

গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরী তাকে বিস্তৃত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। স্বার্থবাদিতার প্রেরণাই হয় এর মধ্যে আসল কার্যকর শক্তি। চোগলখোর ব্যক্তি কারুর কল্যাণকামী হতে পারে না। নিন্দিত দুজনের কারুর কল্যাণ তার অভীপ্সিত হয় না। সে দুজনেরই বন্ধু সাজে কিন্তু অমংগল চায়। তাই সে মনোযোগ দিয়ে দু'জনের কথা শুনে, কারুর প্রতিবাদ করে না। তারপর বন্ধুর নিকট এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে যে আগুন এক জায়গায় লেগেছিল তাকে অন্য জায়গায় লাগাতেও সাহায্য করে। ইসলামী শরীয়ত এ কাজকে হারাম গণ্য করেছে। কারণ এর বিপর্যয়কারী ক্ষমতা গীবতের চাইতেও বেশী। কুরআনে চোগলখোরীকে মানুষের জঘণ্যতম দোষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

অর্থাৎ "কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"

তিনি আরো বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচাইতে খারাপ যার দু'টি মুখ। সে এক দলের নিকট একটি মুখ নিয়ে আসে আর অন্য দলের নিকট আসে অন্য মুখটি নিয়ে।" এ ব্যাপারে যথার্থ ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোথাও কারুর গীবত শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা উভয় পক্ষের

উপস্থিতিতে বিষয়টির অবতারণা করে এমনভাবে এর নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে করে এক পক্ষ এমন কোনো ধারণা পোষণ করার সুযোগ না পায় যে, তার অনুপস্থিতিতে অন্য পক্ষ তার নিন্দা করেছিল। আর যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কোনো দোষের জন্যে গীবত করা হয়ে থাকে তাহলে একদিকে গীবতকারীকে তার গোনাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে এবং অন্যদিকে তার দোষ সংশোধনের পরামর্শ দিতেহবে।

কানাকানি ও ফিস্‌ফিসানীঃ

এ ব্যাপারে সবচাইতে মারাত্মক হচ্ছে ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে কথা ও গোপানে সলা-পরামর্শ করা। যার ফলে ব্যাপার ষড়যন্ত্র ও দলাদলি পর্যন্ত পৌঁছে এবং পরস্পর বিরোধী সংঘর্ষশীল গ্রুপ অস্তিত্ব লাভ করে। শরীয়ত এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। কুরআনে একে শয়তানী কাজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ -

অর্থাৎ "কানাকানি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ।"

এ ব্যাপারে নীতিগত পথনির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছেঃ

إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى -

"যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করো তখন গোনাহ্ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে কানাকানি করো না বরং নেকী ও তাকওয়ার ব্যাপারে কানাকানি করো।"

অর্থাৎ দুই বা কতিপয় ব্যক্তি যদি সদুদ্দেশ্যে এবং তাকওয়ার সীমানার মধ্যে অবস্থান করে কানে কানে আলাপ করে তা'হলে তা কানাকানির আওতাভুক্ত হয় না। তবে দলের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে গোপনে কানে অসৎ কাজের পরিকল্পনা তৈরীর উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে অথবা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশ ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প নিয়ে গোপনে আলাপ-আলোচনা করা অবশ্য এর আওতাভুক্ত। ঈমানদারী ও আন্তরিকতা সহকারে যে মতবিরোধ করা হয় তা কোনদিন কানাকানিকে উদ্বুদ্ধ করে না। এ প্রাসঙ্গিক

যাবতীয় আলোচনা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং দলের সামনে হওয়া উচিত। যুক্তি সহকারে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে হওয়া উচিত। আলোচনার পর মতবিরোধ থেকে গেলেও তা কখনো বিপর্যয়ের কারণ হয় না। দল থেকে সরে গিয়ে একমাত্র সে সকল মতবিরোধের ক্ষেত্রে গোপন কানাকানির প্রয়োজন দেখা দেয় যেগুলো স্বার্থপরতাপূর্ণ না হলেও কমপক্ষে স্বার্থপরতার মিশ্রণযুক্ত। এ ধরনের কানাকানির ফল কখনো শুভ হয় না। এগুলো শুরুতে যতই নিষ্কলংক হোক না কেন ধীরে ধীরে সমগ্র দল এর ফলে কু-ধারণা, দলাদলি ও হানাহানির শিকারে পরিণত হয়। আপোষে গোপন আলোচনা চালিয়ে যখন কতিপয় ব্যক্তি একটি গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাদের দেখাদেখি এভাবে গোপন সলাপরামর্শ করে গ্রুপ বানানোর প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে এমন বিকৃতির সূচনা হয়, যা সর্বোত্তম সৎব্যক্তির দলকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং তাদেরকে পরস্পরের মধ্যে দলাদলিতে লিপ্ত করে। কারো সর্বশেষ পর্যায়ে এ বিকৃতির কার্যতঃ আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ব্যাপারে মুসলামানদেরকে বার বার সতর্ক করেছেন, ভীতি প্রদান করেছেন এবং এ থেকে বাঁচার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

"আরবে যারা নামাজ শুরু করেছে তারা পুনর্বার শয়তানের ইবাদত শুরু করবে, এ ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাই এখন তাদের মধ্যে বিকৃতি সৃষ্টি করার ও তাদের পরস্পরকে সংঘর্ষশীল করার সাথে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা জড়িত।" এমনকি তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে ঈমানদারদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ তারা নিজেরা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"তারা সৌভাগ্যবান যারা ফিতনা থেকে দূরে থাকে এবং যে ব্যক্তি যত বেশী দূরে থাকে সে তত বেশী ভালো।' এ অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চাইতে ভালো এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে ভালো। আর দন্ডায়মান ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে ভালো। অন্য দিকে যদি তারা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করে তাহলে একটি দল হিসেবে নয় বরং সাচ্চা দিলে সংশোধন প্রয়াসী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের প্রথম রুকূতে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

স্বার্থবাদিতার এ তাৎপর্য এবং তার প্রকাশ ও বিকাশের এ সকল পর্যায় সম্পর্কিত শরীয়তের এ বিধানসমূহ হৃদয়ংগম করা তাদের জন্যে একান্ত জরুরী যারা সৎবৃত্তি ও সততার বিকাশ সাধনের জন্যে একত্রিত হয়। তাদের নিজেদেরকে আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার রোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এ রোগে আক্রান্ত হবার পর যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি দেখা দেয় সেগুলো উপলব্ধি করতে হবে। তাদের দলকেও দলগতভাবে সজাগ থাকতে হবে যেন তার মধ্যে স্বার্থবাদিতার জীবাণু অনুপ্রবেশ করে বংশ বিস্তার করার সুযোগ না পায়। নিজেদের পরিসীমার মধ্যে তাদের এমন কোনো ব্যক্তিকে উৎসাহিত না করা উচিত যে নিজের সমালোচনা শুনে ক্ষিপ্ত হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার না করে দাম্ভিকতা দেখায়। যার কথা থেকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার গন্ধ আসে অথবা যার কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করে যে, সে কারো সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাবিয়ে দিতে হবে। যারা অন্যের ব্যাপারে কু–ধারণা পোষণ করে অথবা অন্যের অবস্থা সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করে তার দোষ তালাশ করার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদের নিজেদের সমাজের মধ্যে গীবত ও চোগলখোরীর পথ রুদ্ধ করা উচিত এবং ফিতনা যেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেখানেই সংগে সংগে উপরে বর্ণিত মতে সরল–সোজা ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাদের বিশেষ করে কানাকানির বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এর ফলে দলের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। কোনো ব্যক্তি কোনে বিরোধমূলক বিষয়ে গোপন কানাকানি করে কোনো আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজের সমর্থক বানাবার চেষ্টা করবে, এতে তার কখনো সম্মত হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক দলের মধ্যে এ পদ্ধতি অবলম্বন করছে এমন কোনো আভাস যখনই পাওয়া যাবে তখনই দলকে তাদের সংশোধন বা মুলোচ্ছেদে ব্রতি হতে হবে। এ সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি দলের মধ্যে কোনো প্রকার গ্রুপিং এর ফিতনা দেখা দিয়েই থাকে তাহলে আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকেরাও এক কোণে বসে গোপন কানাকানি শুরু করে দেবে এবং একটা গ্রুপ বানাবার জন্যে ষড়যন্ত্র চালাবে। দলের মধ্যে এ ধরনের কাজের অনুমতি কোনো ক্রমেই দেয়া যেতে পারে না। বরং তাদের নিজেদের এ ফিতনা থেকে দূরে থেকে এর গতিরোধের জন্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালোনো উচিত এবং তাতে ব্যর্থ হলে দলের সম্মুখে প্রকাশ্যে বিষয়টি উপস্থাপিত করা উচিত। যে দলে আন্তরিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য হবে সে দল এ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে অবগত হয়ে সংগে সংগেই এর প্রতিরোধ করবে আর

আর যে দলে ফিতনাবাজ বা নিশ্চিত নিরুদ্বেগ লোকদের সংখ্যাধিক্য হবে সে দল ফিতনায় শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হবে।

মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ঃ

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনিষ্টকারিতাগুলোকে এক কথায় মেজাজের ভারসাম্যহীনতা বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থবাদিতার মোকাবেলায় এটিকে একটি সামান্য দুর্বলতা বলে মনে হয়। কারণ এর মধ্যে কোনো প্রকার অসৎ সংকল্প, অসাধু প্রেরণা ও অপবিত্র ইচ্ছার রেশ দেখা যায় না। কিন্তু অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে স্বার্থবাদিতার পরই এর স্থান দেখা যায় এবং অনেক সময় এর প্রভাব ও ফলাফলের অনিষ্টকারী ক্ষমতা স্বার্থবাদিতার সমপর্যায়ে এসে পৌঁছে।

চিন্তা ও দৃষ্টিভংগী এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার ভারসাম্যহীনতা এই মেজাজের ভারসাম্যহীনতার ফলশ্রুতি। জীবনের বহু সত্যের সাথে হয় এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। মানুষের জীবন অসংখ্য বিপরীতধর্মী উপাদানের আপোষ ও বহু বিচিত্র কার্যকারণের সামষ্টিক কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তার অবস্থাও সমপর্যায়ভুক্ত। মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের একত্রিত হবার পর যে সমস্ত কাঠামোর উদ্ভব হয় তার অবস্থাও এমনটিই হয়ে থাকে। এ দুনিয়ায় কাজ করার জন্যে চিন্তা দৃষ্টিভংগীর এমন ভারসাম্য এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার এমন সমতা প্রয়োজন, যা বিশ্ব প্রকৃতির সমতা ও ভারসাম্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। অবস্থার প্রতিটি গতিধারার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, কাজের প্রত্যেকটি দিক অবলোকন করতে হবে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিভাগকে তার অধিকার দিতে হবে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবীর প্রতি নজর রাখতে হবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ মানের ভারসাম্য অর্জিত না হলেও বলা বাহুল্য, এখানে সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অপরিহার্য। তা যতটা নির্দ্ধারিত মানের নিকটবর্তী হবে ততটা লাভজনক হবে এবং তা থেকে যতটা দূরবর্তী হবে ঠিক ততটাই জীবন সত্যের সাথে সংঘর্ষশীল হয়ে অনিষ্টের কারণ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, তার সবগুলোর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারসাম্যহীন চিন্তার অধিকারীরা মানুষের সমস্যাবলী দেখা ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে একচোখা নীতি অবলম্বন করছে। ওগুলো সমাধানের জন্যে ভারসাম্যহীন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এবং তা কার্যকরী করার জন্যে অসম পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এই হচ্ছে

বিকৃতির আসল কারণ। কাজেই চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীর ভারসাম্য এবং কর্মপদ্ধতির সমতার মাধ্যমেই গড়ার কাজ সম্ভবপর।

ইসলাম আমাদেরকে সমাজ গঠন ও সংশোধনের যে পরিকল্পনা দিয়েছে তা কার্যকর করার জন্যে এ গুণটির বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এ পরিকল্পনাটি আগাগোড়া ভারসাম্য ও সমতারই একটি বাস্তব নমুনা। একে পুঁথির পাতা থেকে বাস্তব জগতে স্থানান্তর করার জন্যে বিশেষ করে সেই সব কর্মী উপযোগী হতে পারে যাদের দৃষ্টি ইসলামের গঠন পরিকল্পনার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ এবং যাদের স্বভাব প্রকৃতি ইসলামের সংশোধন প্রকৃতির ন্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত চরমপন্থী লোকেরা এ কাজকে বিকৃত করতে পারে, যথাযথরূপে সম্পাদন করতে পারেনা।

ভারসাম্যহীনতা সাধারণতঃ ব্যর্থতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সংশোধন ও পরিবর্তনের যে কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে কেবলমাত্র নিজে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যথেষ্ট নয় বরং এই সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষকে এর যথার্থতা, উপকারিতা ও কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করতে হবে এবং নিজের আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে ও এমন পদ্ধতিতে চালাতে হবে যার ফলে মানুষের আশা-আকাংখা আগ্রহ তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যে আন্দোলন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতিতে ভারসাম্যের অধিকারী একমাত্র সে আন্দোলনই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। একটি চরমপন্থী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্যে চরম পন্থা অবলম্বন করা হয়, তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট ও আশান্বিত করার পরিবর্তে সংশয়িত করে। তার এ দুর্বলতা তার প্রচার ক্ষমতা ও অনুপ্রবেশ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তার পরিচালনার জন্যে কিছু চরমপন্থী লোক একত্রিত হয়ে গেলেও সমগ্র সমাজকে তাদের নিজেদের মতো চরমপন্থী বানিয়ে নেয়া এবং সারা দুনিয়ার চোখে ধুলো দেয়া সহজ নয়।

যে দল সমাজ গঠন ও সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় এ বস্তুটি তার জন্যে বিষবৎ।

একগুয়েমী ঃ

মেজাজের ভারসাম্যহীনতার প্রধানতম প্রকাশ হচ্ছে মানুষের একগুয়েমী। এ রোগে আক্রান্ত হবার পর মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যেক বস্তুর একদিক দেখে, অপরদিক

দেখে না। প্রত্যেক বিষয়ের এক দিককে গুরুত্ব দেয়, অন্যদিককে গুরুত্ব দেয় না। যে দিকে তার মন একবার পাড়ি জমায়, সেই এক দিকেই অগ্রসর হতে থাকে, অন্যদিকে নজর দিতে প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে সে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে থাকে। মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সে একদিকে ঝুঁকতে থাকে। যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। একই পর্যায়ের এমনকি তার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যে বস্তুকে খারাপ মনে করে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু একই পর্যায়ে অন্যান্য খারাপ বস্তু বরং তার চাইতেও বেশী খারাপ বস্তুর বিরুদ্ধে ভুলেও কোন কথা বলে না। নীতিবাদীতা অবলম্বন করার পর সে এ ব্যাপারে স্থবিরত্বের প্রত্যন্ত সীমায় পৌছে যায়, কাজেই বাস্তব চাহিদাগুলোর কোনো পরোয়াই করে না। অন্যদিকে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর নীতিহীন হয়ে পড়ে এবং সাফল্যকে আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে ন্যায়-অন্যায় সব রকম উপায় অবলম্বন করতে উদ্যত হয়।

একদেশদর্শীতা ঃ

এ অবস্থা এখানে পৌছে থেমে না গেলে তা সামনে অগ্রসর হয়ে চরম একদেশদর্শীতার রূপ অবলম্বন করে। অতঃপর মানুষ নিজের মতের উপর প্রয়োজনের অধিক জোর দিতে থাকে। মতবিরোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। অন্যের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে না এবং বুঝতে চেষ্টা করে না। বরং প্রত্যেকটি বিরোধী মতের নিকৃষ্টতম অর্থ করে তা হেয় প্রতিপন্ন করতে ও দূরে নিক্ষেপ করতে চায়। এর ফলে দিনের পর দিন সে অন্যের জন্যে এবং অন্যেরা তার জন্যে অসহনীয় হয়ে যেতে থাকে।

একদেশদর্শীতা এখানে থেমে গেলেও ভালো ছিল। কিন্তু তাকে একটি গুণ মনে করে লালন করতে থাকলে মানুষ ক্রুদ্ধভাব, বদরাগী ও কর্কশ হয়ে পড়ে এবং অন্যের নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও তার উপর হামলা করতে উদ্যত হয়। যে কোনো সমাজ জীবনে এ বস্তুটি খাপ খেতে পারে না।

সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা ঃ

এক ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করলে বড়জোর সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে উদ্দেশ্যে সে দলের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তা সম্পাদন করা থেকে বঞ্চিত হবে, এর ফলে কোনো সামষ্টিক ক্ষতি হবে না। কিন্তু কোনো সমাজ সংস্থায়

অনেকগুলো ভারসাম্যহীন মন ও মেজাজ একত্রিত হয়ে গেলে প্রত্যেক ধরনের ভারসাম্যহীনতা এক একটি গ্রুপের জন্ম দেয়। এক চরমপন্থার জবাবে আর এক চরমপন্থা জন্ম নেয়। মতবিরোধ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। সংস্থায় ভাঙ্গন ধরে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে কাজ সম্পাদনের জন্যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু লোক একত্রিত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আবর্তে পড়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

সত্যি বলতে কি, যে কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় করা যায় না বরং যার ধরনই হয় সামষ্টিক তা সম্পাদন করার জন্যে অনেক লোককে এক সাথে কাজ করার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকের নিজের কথা বুঝাতে ও অন্যের কথা বুঝতে হয়। মেজাজের পার্থক্য, যোগ্যতার পার্থক্য, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে হয়, যার অবর্তমানে কোনো প্রকার সহযোগিতা সম্ভবপর হয় না। এ সামঞ্জস্যের জন্যে দীনতা অপরিহার্য। আর এ দীনতা কেবলমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী লোকদের মধ্যে থাকতে পারে, যাদের চিন্তা ও মেজাজ উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে। ভারসাম্যহীন লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলেও তাদের ঐক্য বেশীক্ষণ টিকে না। তাদের দল ভেঙ্গে টুক্রো টুক্রো হয়ে যায় এবং এক এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার রোগী আলাদা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে আবার ভাঙ্গন দেখা দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুক্তাদী ছাড়া কেবল ইমামদেরকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

যারা ইসলামের জন্যে কাজ করেন এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থার সংশোধন ও পুনর্গঠনের প্রেরণা ও ইচ্ছা যাদেরকে একত্রিত করে তাদের আত্মপর্যালোচনা করে এই ভারসাম্যহীনতা উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে এবং তাদের দলের সীমানার মধ্যে যাতে করে এ রোগ মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠতে পারে এজন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনের ঘোর বিরোধী কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী তাদের সামনে থাকা উচিত। কুরআন দ্বীনের ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করাকে আহ্‌লে কিতাবদের মৌলিক ভ্রান্তি গণ্য করেছে (ইয়া আহ্‌লাল কিতাবি লা তাগ্‌লু ফী দ্বীনিকুম)। এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের অনুসারীদেরকে এ থেকে রেহাই দেয়ার জন্যে নিম্নোক্ত ভাষায় তাকীদ করেছেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ -

"সাবধান। তোমরা একদেশদর্শীতা ও চরম পন্থা অবলম্বন করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করেই ধ্বংস হয়েছে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক বক্তৃতায় তিনবার বলেনঃ হালাকাল মুতানাত্তিয়ুন—অর্থাৎ, কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ও বাড়াবাড়ির পথ আশ্রয়কারীরা ধ্বংস হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "বুয়িসতু বিল হানীফিয়্যাতিস সামাহাহ"—অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রান্তিকতার মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এনেছেন যার মধ্যে ব্যাপকতা ও জীবন ধারার প্রত্যেকটি দিকের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। এ দাওয়াত দানকারীদের যে পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে এর প্রথম আহবায়ক তা নিম্নোক্তভাবে শিখিয়েছেনঃ

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا -

"সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না।"

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

"তোমাকে সহজ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্যে নয়।"

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا -

"কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহকে (সঃ) দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার মধ্য থেকে সবচাইতে সহজটাকে গ্রহণ করেননি, তবে যদি তা গোনাহ্‌র নামান্তর না হয়ে থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ -

"আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন, তাই তিনি সকল ব্যাপারে কোমল ব্যবহার পছন্দ করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ ـ

"যে ব্যক্তি কোমল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকেও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।' (মুসলিম)

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفِيقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ ـ

"আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন এবং তিনি কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার ফলে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা ও অন্য কোনো ব্যবহারের ফলে দান করেন না।' (মুসলিম)

এ ব্যাপক নির্দেশাবলী সামনে রেখে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তিরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেদের মন মাফিক বিষয়গুলো বাছাই করার পরিবর্তে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী ঐ অনুযায়ী ঢালাই করার অভ্যাস করেন তাহলে তাদের মধ্যে দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যাবলীকে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নীতিতে সমাধান করার জন্যে যে ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সংকীর্ণমনতা ঃ

ভারসাম্যহীন মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি দুর্বলতাও মানুষের মধ্যে দেখা যায়। একে সংকীর্ণমনতা বলা যায়। কুরআনে একে 'শুহহে নাফ্স' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে, "যে ব্যক্তি এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে-ই সাফল্য লাভ করেছে" (ওয়া মাই ইউকা শুহহা নাফসিহি ফাউলা-ইকা হুমুল মুফলিহুন) এবং কুরআন একে তাকওয়া ও ইহসানের পরিবর্তে একটি ভ্রান্ত ঝোঁক প্রবণতা রূপে গণ্য করেছে (ওয়া উহ্দিরাতিল আনফুসুশ শুহ্হা ওয়া ইন তুহসিনু ওয়া তাত্তাকু ফাইন্নাল্লাহা কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা)। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের জীবন পরিবেশে অন্যের জন্যে খুব কমই স্থান রাখতে চান। সে নিজে যতই বিস্তৃত হোক না কেন নিজের স্থান থেকে তার নিকট তা অত্যন্ত সংকীর্ণই দৃষ্টিগোচর হয়।

আর অন্যলোক তার জন্যে নিজেকে যতই সংকুচিত করুক না কেন সে অনুভব করে যেন তারা অনেক ছড়িয়ে আছে। নিজের জন্যে সে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা চায় কিন্তু অন্যের জন্যে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না। নিজের সৎকাজগুলো নিছক ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে। নিজের দোষ তার দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে কিন্তু অন্যের কোন দোষই সে ক্ষমা করতে পারে না। নিজের অসুবিধাগুলোকে সে অসুবিধা মনে করে কিন্তু অন্যের অসুবিধাগুলো তার দৃষ্টিতে নিছক বাহানাবাজী মনে হয়। নিজের দুর্বলতার কারণে সে যে সুবিধা ভোগ করতে চায় অন্যকে তা দিতে প্রস্তুত হয় না। অন্যের অক্ষমতার পরোয়া না করে সে তাদের নিকট চরম দাবী পেশ করে কিন্তু নিজের অক্ষমতার ক্ষেত্রে এসব দাবী পূরণ করতে সে রাজী থাকে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি ও রুচি সে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে সে একটুও চেষ্টা করে না। এ অসৎ গুণটি বাড়তে বাড়তে চোগলখোরী ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সে অন্যের সামান্য সামান্য দোষের সমালোচনা করে কিন্তু নিজের দোষের সমালোচনায় লাফিয়ে ওঠে। এ সংকীর্ণমনতার আর এক রূপ হচ্ছে দ্রুত ক্রোধান্বিত হওয়া, অহংকার করা ও পরস্পরকে বরদাশ্‌ত না করা। সমাজ জীবনে এহেন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে চলাফেরাকারী প্রত্যেকটি লোকের জন্যে বিপদ স্বরূপ।

কোন দলের মধ্যে এ রোগের অনুপ্রবেশ মূলতঃ একটি বিপদের আলামত। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা-সাধনা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা দাবী করে। এ ছাড়া চার ব্যক্তিও একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। কিন্তু সংকীর্ণমনতা ভালোবাসা ও সহযোগিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং অনেক সময় ওগুলোকে খতম করে দেয়। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হয় সম্পর্কের তিক্ততা ও পারস্পরিক ঘৃণা। এটি মানুষের মন ভেঙে দেয় এবং সহযোগীদেরকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোনো মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে তো দূরের কথা সাধারণ সমাজ জীবনের জন্যে উপযোগী হতে পারে না। বিশেষ করে এ গুণটি ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উপযোগী গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সেখানে সংকীর্ণমনতার পরিবর্তে উদারতা, কৃপণতার পরিবর্তে দানশীলতা, শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতার প্রয়োজন। এজন্যে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু লোকের প্রয়োজন। এ দায়িত্ব একমাত্র তারাই পালন

করতে পারে যারা উদার হৃদয়ের অধিকারী, যারা নিজেদের ব্যাপারে কঠোর ও অন্যের ব্যাপারে কোমল, যারা নিজেদের জন্যে সর্বনিম্ন সুবিধা চায় এবং অন্যের জন্যে চায় সর্বোচ্চ সুবিধা, যারা নিজেদের দোষ দেখে কিন্তু অন্যের গুণ দেখে, যারা কষ্ট দেবার পরিবর্তে কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে অভ্যস্ত বেশী এবং চলন্ত ব্যক্তিদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার পরিবর্তে যারা পড়ে যাচ্ছে তাদের হাত ধরে টেনে তোলার ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দল কেবল নিজেদের বিভিন্ন অংশকে মজবুতভাবে সংযুক্ত রাখবে না বরং তার চারপাশের সমাজের বিক্ষিপ্ত অংশকেও বিন্যস্ত করতে ও নিজের সাথে সংযুক্ত করতে থাকবে। বিপরীত পক্ষে সংকীর্ণমনা লোকদের দল নিজেরাতো বিক্ষিপ্ত হবেই উপরন্তু বাইরের যে সমস্ত লোকও তাদের সংস্পর্শে আসবে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

দুর্বল সংকল্প ঃ

এ রোগটি মানুষের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কোন আন্দোলনের ডাকে মানুষ অন্তর থেকে সাড়া দেয়, প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা জোশও দেখায় কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তার জোশে ভাঁটা পড়ে। এমন কি যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সে অগ্রসর হয়েছিল তার সাথে তার কোন সত্যিকার সংযোগ থাকে না। এবং গভীর আগ্রহ সহকারে যে দলে শামিল হয়েছিল তার সাথেও কোনো বাস্তব সম্পর্ক থাকে না। যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সে এ আন্দোলনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল সেগুলোর উপর সে তখনো নিশ্চিত থাকে। সে মুখে তখনো তাকে সত্য ঘোষণা করতে থাকে এবং তার মন সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, কাজটি করতে হবে এবং অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তার আবেগ ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে ও কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অসদুদ্দেশ্য স্থান পায় না। উদ্দেশ্য থেকে সে সরেও যায় না, আদর্শও পরিবর্তন করে না। এ জন্যে সে দল ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করে না কিন্তু প্রাথমিক আবেগ ও জোশ প্রবণতা ঠান্ডা হয়ে যাবার পর এই সংকল্পের দুর্বলতাই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

সংকল্পের দুর্বলতার কারণে মানুষ প্রথম দিকে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে। দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে। উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হয়। যে কাজকে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গণ্য করে এগিয়ে এসেছিল দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজকে তার ওপর অগ্রাধিকার দিতে থাকে।

তার সময়, শ্রম ও সম্পদের মধ্যে তার ঐ তথাকথিত জীবনোদ্দেশ্যের অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং যে দলকে সত্য মনে করে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তার সাথেও সে নিছক যান্ত্রিক ও নিয়মানুগ সম্পর্ক কায়েম রাখে। ঐ দলের ভালমন্দের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না।

যৌবনের পরে বার্ধক্য আসার ন্যায় এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়। নিজের এ অবস্থা সম্পর্কে মানুষ নিজে সচেতন না হলে এবং অন্য কেউ তাকে সচেতন না করলে কোনো সময়ও সে এ কথা চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করে না যে, যে বস্তুকে সে নিজের জীবনোদ্দেশ্য গণ্য করে তার জন্যে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার সংকল্প করেছিল তার সাথে এখন সে কি ব্যবহার করছে। এভাবে নিছক গাফলতি ও অজ্ঞানতার কারণে মানুষের আগ্রহ ও সম্পর্ক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, এমনকি এভাবে অবশেষে একদিন নিজের অজান্তে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

দলীয় জীবনে যদি প্রথমেই মানুষের মধ্যে এ অবস্থার প্রকাশ সম্পর্কে সতর্ক না হওয়া যায় এবং এর বিকাশের পথরোধ করার চিন্তা না করা হয় তাহলে যাদের সংকল্পের মধ্যে সবেমাত্র সামান্য দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে তারা ঐ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির ছোঁয়াচ পেয়ে যাবে এবং এভাবে ভালো কর্মতৎপর ব্যক্তিও অন্যকে নিষ্ক্রিয় দেখে নিজেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তাদের একজনও এ কথা চিন্তা করবে না যে, সে অন্যের জন্যে নয়, বরং নিজের জীবনোদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্যে এসেছিল এবং অন্যেরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ হলেও সে কেন তা থেকে বিচ্যুত হবে? তাদেরকে এমন একদল লোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যারা অন্য সাথীদের দেখাদেখি জান্নাতের পথ পরিহার করে। অর্থাৎ জান্নাত যেন তার নিজের মঞ্জিলে মাকসুদ ছিল না। অথবা অন্য সাথীদের জান্নাতে যাবার শর্তেই যেন সে জান্নাতে যেতে চাচ্ছিল। আর সম্ভবতঃ অন্য সাথীদের জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে সে তাদের সাথে জাহান্নামে যাবারও সংকল্প করবে। কারণ তার নিজের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্যের উদ্দেশ্য তার উদ্দেশ্য। এ ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে যারা বিচরণ করে তারা হামেশা নিষ্ক্রিয় লোকদেরকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে। সক্রিয় লোকদের মধ্যে তারা অনুসরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় না।

তবুও সোজাসুজি কোনো ব্যক্তির সংকল্পের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। কিন্তু মানুষ যখন একবার দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়

তখন আরো বহু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে থাকে এবং খুব কম লোকই একটি দুর্বলতার সাহায্যে অন্যান্য দুর্বলতাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পথ রোধ করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণতঃ মানুষ নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রকাশ করতে লজ্জা অনুভব করে। মানুষ তাকে দুর্বল মনে করবে এটা সে বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয় না। সংকল্পের দুর্বলতা তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, এ কথা সে সরাসরি স্বীকার করে না। একে ঢাকা দেবার জন্যে সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এবং তার প্রত্যেকটি পন্থাই একটি অন্যটির চাইতে নিকৃষ্টতম হয়।

যেমন, সে কাজ না করার জন্যে নানান টালবাহানা করে এবং প্রতিদিন কোনো না কোনো ভুয়া ওজর দেখিয়ে সাথীদেরকে ধোকা দেবার চেষ্টা করে। সে বোঝাতে চায় যে, উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক ও সে ব্যাপারে আগ্রহের স্বল্পতা নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ নয় বরং তার পথে যথার্থই বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এভাবে যেন নিষ্ক্রিয়তাকে সাহায্য করার জন্যে মিথ্যাকে আহবান জানানো হলো। যে ব্যক্তি প্রথম দিকে কেবল উন্নতির উচ্চমার্গে পৌছানো পরিহার করেছিল এখান থেকেই তার নৈতিক পতন শুরু হলো।

এ বাহানা যখন পুরাতন হয়ে গিয়ে নিরর্থক প্রমাণিত হয় এবং এবার আসল দুর্বলতার রহস্য ভেদ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তখন মানুষ এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে, সে আসলে নিজের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি বরং দলের কিছু দোষ-ত্রুটি তাকে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ সে নিজে অনেক কিছু করতে চাচ্ছিল কিন্তু সাথীদের বিকৃতি ও ভ্রান্তি তার মন ভেঙ্গে দিয়েছে। এভাবে পতনোম্মুখ ব্যক্তি যখন একটুও দাঁড়াতে পারে না তখন নীচে নেমে আসে এবং নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে যে কাজ আঞ্জাম দিতে সে সক্ষম হয়নি তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

প্রথমাবস্থায় এ মানসিক পক্ষাঘাতটি চাপা ও অস্পষ্ট থাকে।এ ব্যক্তির এ মানসিক রোগের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র দোষের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট-চাপা অভিযোগ উত্থিত হয়। কিন্তু এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। সাথীরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আসল রোগটি অনুধাবন করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, তাহলে এ পতনোম্মুখ ব্যক্তিটির পতন সম্ভবতঃ রোধ হতে পারে এবং তাকে ওপরেও ওঠানো যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নাদান বন্ধু অত্যাধিক জোশ ও বিস্ময়ের কারণে ব্যাপারটি অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় এবং তাকে বিস্তারিত বলতে বাধ্য

করে। অতঃপর সে নিজের মানসিক রুষ্টতাকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্যে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো বাছাই করে করে একত্রিত করে। জামায়াতের ব্যবস্থা ও তার কাজের মধ্যে খুঁত আবিষ্কার করে। এবং এসবের একটি তালিকা তৈরী করে একত্রিত করে সামনে রেখে দেয়। সে বলতে চায় এসব গলদ দেখেই তার মন বিরূপ হয়ে ওঠেছে। অর্থাৎ তার যুক্তি হয় এই যে, তার মতো মর্দে কামেল যে সকল প্রকার দুর্বলতামুক্ত ছিল, সে কেমন করে এসব দুর্বল সাথী ও গলদে পরিপূর্ণ দলের সাথে চলতে পারে? এ যুক্তি গ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয় যে, একথা যদি সত্যি হতো তাহলে তার নিষ্ক্রিয় হবার পরিবর্তে আরো বেশী কর্মতৎপর হবার প্রয়োজন ছিল। যে কাজকে নিজের জীবনোদ্দেশ্য মনে করে তা সম্পাদন করার জন্যে সে অগ্রসর হয়েছিল, অন্যেরা নিজেদের গলদকারিতার কারণে যদি তাকে বিকৃত করার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অত্যাধিক উৎসাহ-আবেগের সাথে ঐ কাজ সম্পাদন করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের গুণাবলীর সাহায্যে অন্যের দোষের ক্ষতিপূরণ করা উচিত ছিল। আপনার ঘরে আগুন লাগলে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যদি তা নিভাবার ব্যাপারে গাফলতি করে তাহলে আপনি মন খারাপ করে বসে পড়বেন, না জ্বলন্ত ঘরকে রক্ষা করার জন্যে গাফেলদের চাইতে বেশী তৎপর হবেন?

এ বিষয়ের সব চাইতে দুঃখজনক দিক হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের ভুল ঢাকবার ও নিজেকে সত্যানুসারী প্রমাণ করার জন্যে নিজের আমলনামার সমস্ত হিসাব অন্যের আমলনামায় বসিয়ে দেয়। এ কাজ করার সময় সে ভুলে যায় যে, আমলনামায় এমন একটি হিসাবও রয়েছে যেখানে কোনো প্রকার কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে একটি অক্ষরও বাড়ানো যাবে না। সে অন্যের আমলনামায় অনেক দুর্বলতা দেখিয়ে দেয় অথচ সেগুলোর মধ্যে সে নিজে লিপ্ত থাকে। সে দলের কাজের মধ্যে এমন অনেক ত্রুটি নির্দেশ করে যেগুলো সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার নিজের ভূমিকা অন্যের চাইতে কম নয়, বরং অনেক বেশী। সে নিজে যেসব কাজ করেছে সেগুলোরই বিরুদ্ধে সে একটি দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা তৈরী করে এবং যখন সে বলে, এসব দেখে শুনে তার মন ভেঙ্গে গেছে তখন তার পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এসব অভিযোগ থেকে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

মানুষের কোন দল দুর্বলতাশুন্য হয় না। মানুষের কোনো কাজ ত্রুটিমুক্ত হয় না। মানুষের সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্যে ফেরেশতার সমাবেশ হবে এবং

পরিপূর্ণ মান অনুযায়ী সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হবে, দুনিয়ায় কখনো এমনটি দেখা যায়নি এবং দেখা যেতেও পারে না। দুর্বলতার অনুসন্ধান করলে কোথায় তার অস্তিত্ব নেই বলে দাবী করা যেতে পারে? ত্রুটি খুঁজে বেড়ালে তা পাওয়া যাবে না এমন কোন্ জায়গাটি আছে? মানুষের কাজ দুর্বলতা ও ত্রুটি সহকারেই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিপূর্ণ মানে পৌঁছার যাবতীয় কোশেশ সত্ত্বেও কমপক্ষে এ দুনিয়ার এমন কোনো অবস্থায় পৌঁছার তার কোন সম্ভাবনাই নেই যেখানে মানুষ ও তার কাজ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে যায়।

এ অবস্থায় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করা বা পূর্ণতার মানে পৌঁছাবার জন্যে আরো প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে যদি এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে এর চাইতে ভালো কাজ আর নেই। এ পথেই মানুষের কাজের মধ্যে যাবতীয় সংশোধন ও উন্নতি সম্ভবপর। এ ব্যাপারে গাফলতি দেখানো ধ্বংসের নামান্তর। কিন্তু যদি কাজ না করার ও মন খারাপ করে বসে যাবার জন্যে বাহানা বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও সামষ্টিক দোষ-ত্রুটি তালাশ করা হয়, তাহলে তাকে একটি নির্ভেজাল শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা ও নফসের কূটকৌশল বলে অভিহিত করা যায়। টালবাহানাকারী ব্যক্তি যে কোন সম্ভাবনাময় অবস্থায় এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে ফেরেশতাদের কোনো দল এসে মানুষের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ বাহানাবাজীর অবসান হবে না। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি মুক্ত হবার প্রমাণ পেশ না করে এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে তার পক্ষে এটা মোটেই শোভা পায় না। এসব কার্যকলাপের দ্বারা কখনো কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি দূর হয় না বরং এগুলো দুর্বলতা ও ত্রুটি বাড়াবারই পথ প্রশস্ত করে। ফলে দেখা যায়, এ পথ অবলম্বন করে মানুষ তার চারপাশের অন্যান্য দুর্বলমনা লোকদের নিকট একটি খারাপ দৃষ্টান্ত পেশ করে। সে সবাইকে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে সমাজে উপহাসের পাত্র না হবার এবং নিজের মনকেও ধোকা দিয়ে নিশ্চিন্ত করার পথ দেখিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি তার পথ অনুসরণ করে মানসিক পীড়ার ভান করতে শুরু করে এবং দুঃখ-কষ্টকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্যে সাথীদের দুর্বলতা ও দলের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে তার একটি ফিরিস্তি তৈরী করে। অতঃপর এখান থেকে অসৎ কাজের সিলসিলা শুরু হয়। একদিকে দলের মধ্যে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান এবং দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এটি তার নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করে। অন্যদিকে ভালো ভালো সক্রিয় ও আন্তরিকতাসম্পন্ন

কর্মী, যাদের মধ্যে কোন দিন সংকল্পের দুর্বলতা ঠাঁই পায়নি, তারাও এ দুর্বলতা ও দোষ–ত্রুটির চর্চার ফলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে। তারপর এ রোগের চিকিৎসার জন্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বিরূপমনা ব্যক্তিদের একটি ব্লক গড়ে উঠতে থাকে। মানসিক রুষ্টতা একটি পদ্ধতি ও আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রুষ্ট করা ও রুষ্টতার স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা দস্তুরমত একটি কাজে পরিণত হয়। যারা আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তারা এ কাজে বেশ সক্রিয়তা দেখাতে থাকে। এভাবে তাদের মৃত আগ্রহ জীবন্ত হয়ে ওঠে কিন্তু এমনভাবে এ জীবন লাভ হয় যে, মৃত্যুর চাইতে তার জীবন লাভ হয় অনেক বেশী শোকাবহ।

সমাজ সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্যে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রত্যেকটি দলের এ বিপদটি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। এ দলের কর্মী ও পরিচালকবৃন্দের সংকল্পের দুর্বলতা উদ্ভূত ক্ষতি, তার একক ও মিশ্রিত রূপের মধ্যকার পার্থক্য, তাদের প্রত্যেকের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং তার প্রারম্ভিক চিহ্ন প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই তার সংশোধনের

সংকল্পের দুর্বলতার মৌলিক রূপ হচ্ছে এই যে, দলের কোন ব্যক্তি তার কাজকে সত্য এবং তা সম্পাদনের দায়িত্ব বহনকারী দলকে যথার্থ মেনে নিয়ে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয়তা ও অনীহা দেখাতে থাকে। এ অবস্থা সৃষ্টির সাথে সাথেই প্রতিকারমূলক কয়েকটি কাজ করা উচিত।

এক ।। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে জানতে হবে তার নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ কি এবং সংকল্পের আসল দুর্বলতাই তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে অথবা কোন সত্যিকার অসুবিধা তাকে নিষ্ক্রিয় হবার পথে রসদ যোগাচ্ছে? যদি সত্যিকার অসুবিধার সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে দলকে সে সম্পর্কে অবগত করা উচিত। এ অবস্থায় তা দূর করার জন্যে সাথীকে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা তার নিষ্ক্রিয়তার ভুল অর্থ গ্রহণ করব না এবং তা অন্যের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত রূপেও প্রতিভাত হবে না। আর যদি সংকল্পের দুর্বলতাই আসল কারণ রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলে আজে–বাজে পথে অগ্রসর না হয়ে যারা সত্যিকার অসুবিধার কারণে কর্মতৎপর হতে পারছে না তাদের থেকে এহেন ব্যক্তির বিষয়টি বুদ্ধিমত্তার সাথে দলের সম্মুখে আলাদা করে তুলে ধরতে হবে।

দুই ।। সংকল্পের দুর্বলতার কারণে যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তার অবস্থা যখনই দলের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে তার দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে দলের ভালো ভালো লোকদের তার প্রতি নজর দেয়া উচিত। তার মৃতপ্রায় প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত ও কার্যতঃ তাকে নিজেদের সাথে রেখে সক্রিয় করার চেষ্টা করতে হবে।

তিন ।। এহেন ব্যক্তির সমালোচনা করতে থাকা উচিত। দলের মধ্যে তার এ নিষ্ক্রিয়তা ও গাফলতি যেন একটি মামুলী বিষয়ে পরিণত না হয়। অন্যেরা যেন পরস্পরের কাঁধে ভর করে বসে যেতেই না থাকে। দলের লোকেরা নিজেদের সময়, শ্রম ও সম্পদের কত অংশে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে কতটা ব্যয় করছে এবং নিজেদের যোগ্যতার তুলনায় তাদের কর্মতৎপরতার হার কি, এ সম্পর্কে দলের মধ্যে মাঝে মাঝে সমালোচনা পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সামলোচনার তুলাদন্ডে যে ব্যক্তি হালকা প্রতীয়মান হয় তার পক্ষে লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ লজ্জা অন্যদেরকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এ সামলোচনা যেন এমনভাবে না হয় যার ফলে একক দুর্বল সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি মিশ্রিত সংকল্পের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যে দুর্বলতা জন্ম নেয় তাকে দূর করতে না পারলেও কমপক্ষে বাড়াতে না দেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক পথ। অজ্ঞতার সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোশ দেখাবার ফলে অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আরো বৃহত্তম অসত্যের দিকে এগিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত হয়।

সংকল্পের দুর্বলতার মিশ্রিত রূপ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের দুর্বলতার উপর মিথ্যা ও প্রতারণার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করে এবং অগ্রসর হতে হতে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, যেটি আছে দলের মধ্যে। এটি নিছক একটি দুর্বলতাই নয় বরং অসৎ চরিত্রের একটি প্রকাশও বটে। সততা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে যে দল দুনিয়ায় সংশোধন করতে চায় তার মধ্যে এ জাতীয় কোনো প্রবণতার বিকাশ ও লালনের সুযোগ না দেয়া উচিত।

এর প্রথম পর্যায়ে মানুষ কাজ না করার জন্যে মিথ্যা ওজর ও ভিত্তিহীন বাহানা পেশ করে। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা ঐ ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর, যার মধ্যে এ নৈতিক দোষ প্রকাশিত হতে দেখা যায় এবং ঐ জামায়াতের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা রূপে প্রতীয়মান হয়, যার সাথে সংযুক্ত হয়ে বহু লোক একটি মহান

উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে জান-মাল কোরবানী করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এহেন দলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে এতটুকু নৈতিক সাহস ও সক্রিয় বিবেক থাকতে হবে যার ফলে নিজের প্রেরণার দুর্বলতার কারণে কাজ না করলেও যেন সে নিজের দুর্বলতার দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়। একবার এ দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার চাইতে ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে কোনো ব্যক্তির সারা জীবন এ দুর্বলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা অনেক বেশী ভালো। এ ভুল প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই তার সমালোচনা হওয়া উচিত এবং কখনো একে উৎসাহিত করা উচিত নয়। নিরিবিলিতে সমালোচনা করার পর যদি সে এ পথ পরিহার না করে তাহলে প্রকাশ্যে দলের মধ্যে তার সমালোচনা করতে হবে এবং যে সব ওজরকে সে যুক্তি হিসেবে পেশ করছে সেগুলোর চেহারা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফলতি দেখানোর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত ত্রুটির বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে দলের মধ্যে সেগুলোর অনুপ্রবেশের দুয়ার উন্মুক্ত করা।

এর দ্বিতীয় পর্যায়ে গাফেল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার জন্যে দলের লোকদের দুর্বলতা এবং দলের কাজ ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহকে দায়ী করে সেগুলোকেই নিজের বিরূপতার কারণ গণ্য করে। আসলে এটি হচ্ছে বিপদের সিগন্যাল। এ থেকে ঐ ব্যক্তি যে ফিতনা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তাকে ঐ বিরূপতার বিস্তারিত কারণ জিজ্ঞেস করা ভুল। তাকে এ প্রশ্ন করার ফল দাঁড়াবে যে, যে ফিতনার পথের মাথায় সে পৌঁছে গেছে তার ওপর তাকে পরিচালিত করতে সাহায্য করা হবে। এখানে তাকে দোষারোপ করার ব্যাপক অনুমতি দেবার পরিবর্তে তার বন্ধুদের উচিত তাকে খোদার ভয় দেখানো এবং তাকে এই মর্মে লজ্জা দেয়া যে, তার নিজের ত্রুটিপূর্ণ কর্ম ও চরিত্র নিয়ে সে কেমন করে অন্যের সমালোচনা করার সাহস করে। পরিশ্রমকারী, সক্রিয় ও তৎপর ব্যক্তিরা এবং যারা অর্থ ও সময়ের বিপুল কোরবানী করেছে তারা যদি তার কর্মহীনতাকে নিজেদের বিরূপতার কারণ রূপে গণ্য করে তাহলে তা যুক্তিসংগত হবে। কিন্তু যেখানে বিরূপকারীর দোষগুলো সৃষ্টির ব্যাপারে তার নিজের অংশ অন্যের চাইতে বেশী এবং কাজ নষ্ট করার ব্যাপারে তার নিজের কাজ অন্যের জন্যে দৃষ্টান্তে পরিণত হচ্ছে, সেখানে সে কেমন করে বিরূপ হয়? সন্দেহ নেই নিজের সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবশ্যি দলকে অবহিত থাকতে হবে.

এবং দলের কখনো এগুলো জানার ব্যাপারে গড়িমসি করা এবং এগুলো সংশোধনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু দলের যেসব কর্মী দলের কাজের ব্যাপারে সবচাইতে বেশী তৎপর এবং যারা জান প্রাণ দিয়ে কাজ করে এগুলো বিবৃত করা তাদের কাজ। উপরন্তু তারা ঈমানদারীর সাথে সমালোচনাও করতে পারে। যেসব লোক কাজে ফাঁকি দেয়, ঢিলেমি দেখায় ও ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে তারা অগ্রসর হয়ে দলের ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করবে, কোনো নৈতিক আন্দোলনে এহেন নির্লজ্জতাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। এহেন আন্দোলনে তারা কেবল নিজেদের লজ্জা ও ত্রুটি স্বীকার করে যাবে, সমালোচনা ও সংস্কার করার যোগ্যতা তাদের নেই। এ যোগ্যতায় যদি তারা নিজেরাই অধিষ্ঠিত হয় তাহলে এটি মারাত্মক নৈতিক দোষের আলামত রূপে গণ্য হবে। আর যদি দলের মধ্যে তাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দল নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা নীতিগত কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে এই যে, একটি গতিশীল দলের সুস্থ অংগসমূহের অনুভূতি ও অসুস্থ অংগসমূহের অনুভূতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। তার সুস্থ অংগসমূহ হামেশা নিজেদের কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে। এ কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে নিজেদের ধন,মন,প্রাণ সবকিছু নিয়োজিত করে। তাদের কার্যবিবরণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফলতি দেখায়নি। আর অসুস্থ অংগসমূহ কখনো নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে না অথবা কিছুকাল তৎপর থাকার পর নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়। তাদের কার্যবিবরণী তাদের গাফলতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে। এ দু'ধরনের অনুভূতির পার্থক্য সুস্থ চোখ ও অসুস্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। দল কেবলমাত্র নিজের সুস্থ অংগসমূহের অনুভূতির মাধ্যমেই নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। যে অংগ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কাজ থেকে দূরে থাকার জন্যে নিজের বিরূপ মনোভাবের কথা প্রকাশ করছে সে কখনো তার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হতে পারে না। তার অনুভূতি শতকরা একশ' ভাগ না হলেও আশি-নব্বই ভাগ বিভ্রান্তিকর হবে। যে দল আত্মহত্যা করতে চায় না সে কোনোক্রমেই এ ধরনের অনুভূতির উপর নিজের ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। ত্রুটি ও দুর্বলতা যা কিছু উপস্থিত করা হবে তা শুনে অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত। অতঃপর তার উপর আমাদের

কাজের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত, এ ধরনের কথা হয়তো কোনো নেকীর কাজ হতে পারে, কিন্তু তা কোনো বুদ্ধিমানের নেকী নয়, বোকার নেকী। এ জাতীয় নেক লোকেরা দুনিয়ায় অতীতে কিছুই করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যাতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা যত বড় অজ্ঞতা, যে কোনো ব্যক্তির মন্তব্যের ভিত্তিতে নিজের ত্রুটি ও কর্মক্ষমতার আন্দাজ করে নেয়া এবং মন্তব্যকারী পরিস্থিতি সম্পর্কে কতদূর যথার্থ জ্ঞান রাখে এবং সে সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করার যোগ্যতা তার কতটুকু এ বিষয়টি যাচাই না করাও তার চাইতে কম অজ্ঞতা নয়।

এ পর্যায়ে আর একটি কথাও ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত। যদি কোনো দল একটি আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার সামনে কাজের যোগ্যতা ও নৈতিকতার দুটি বিভিন্ন মান থাকে। একটি হচ্ছে অভীষ্ট মান অর্থাৎ যে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হবার জন্যে অনবরত প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কার্যোপযোগী হবার সর্বনিম্ন মান, যার ভিত্তিতে কাজ চালানো যেতে পারে এবং যার থেকে নীচে নেমে যাওয়া অসহনীয়। এ দু'ধরনের মান সম্পর্কে বিভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন লোক বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এক ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক আসল উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকেও এমনভাবে এর মধ্যে শামিল হতে পারে যার ফলে তার ধন, সময়, শক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষয়িত হয় না। এ মানসিকতা অনেক সময় চিন্তার বিলাসিতা ও পলায়নী প্রচেষ্টার জন্যে প্রবঞ্চনামূলক ওজর হিসেবে নৈতিকতার আকাশে বিচরণ করে এবং অভীষ্ট মানের চাইতে কমের ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যা কিছু সে এর চাইতে কম দেখে তারই উপর নিজের বিপুল অস্থিরতা ও বিরূপতা প্রকাশ করে। কিন্তু কাজে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে নয় বরং সচেতন বা অবচেতন যে কোনো ভাবেই হোক কাজ থেকে পলায়ন করার জন্যেই এ অস্থিরতা ও বিরূপতার প্রকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যদিও উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করাকে অত্যাধিক বরং পূর্ণ গুরুত্ব দেয় কিন্তু ভাববাদীতার শিকার হবার কারণে অভীষ্ট মান ও কার্যোপযোগী হবার সর্বনিম্ন মানের মধ্যকার যথাযথ পার্থক্য অনুধাবন করে না। এ ব্যক্তি নিজেই বারবার দোটানায় পড়ে যায়। উপরন্তু প্রথম ধরনের মানসিকতার

ছোঁয়াচও সহজেই লেগে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজেকে পেরেশান করে এবং যারা কাজ করে তাদের জন্যেও যথেষ্ট পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যথার্থই উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করে। তারা নিজেদের উপর এ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এ অনুভূতি রাখে। তাদের এ অবস্থা ও দায়িত্ব বোধের কারণে তারা বাধ্য হয়ে সব সময় দু'ধরনের মানের মধ্যে যথাযথ পার্থক্য বজায় রেখে কাজ করে এবং কোনো যুক্তিসংগত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রগতি যেন প্রভাবিত হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখে। তারা কখনো অভীষ্ট মান বিস্মৃত হয় না। সে পর্যন্ত পৌছবার চিন্তা থেকে এক মুহূর্তও গাফেল হয় না। তাথেকে নিম্নমানের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। কিন্তু কর্মোপযোগী সর্বনিম্ন মানের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং এ মান থেকেও লোকদের নীচে নেমে যাবার কারণে নিজেদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করার বদলে তাদেরকে সরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করাকে অধিক বেহ্তর মনে করে। তাদের জন্যে নিজেদের শক্তির যথাযথ জরীপ ও সে অনুযায়ী কার্যবিস্তার করা ও তার গতিবেগের মধ্যে কমবেশী করা অবশ্যি অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ভুল করলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ জরীপ করার জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতার মাধ্যমে পথ নির্দেশ লাভ করবে সে মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ দেবে। একমাত্র এই তৃতীয় ধরনের মানসিকতাই তার সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে এবং এ মানসিকতাই গড়ে তুলতে হবে।